কমললতা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

: প্রাপ্তিস্থান :

কামিনী প্রকাশালয়

১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন,

কলিকাতা-৭০০০০৯

॥ এক ॥

গহরের খোঁজে আসিয়া নবীনের সাক্ষাৎ মিলিল। সে আমাকে দেখিয়া খুশি হইল, কিন্তু মেজাজটা ভারী রুক্ষ ; বলিল, দেখুন গে ঐ বোষ্টমী বেটীদের আড্ডায়। কাল থেকে ত ঘরে আসাই হয় নি।

সে কি কথা, নবীন ? বোষ্টমী এলো আবার কোথা থেকে ?

একটা ? এক পাল এসে জুটেছে।

কোথা থাকে তারা ?

ঐ ত মুরারিপুরের আখড়ায়। এই বলিয়া নবীন হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, হায় বাবু, আর সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। বুড়ো মথুরেদাস বাবাজী মলো, তার জায়গায় এসে জুটলো এক ছোকরা বৈরাগী, তার গণ্ডা-চারেক সেবাদাসী। দ্বারিকদাস বৈরাগীর সঙ্গে আমাদের বাবুর খুব ভাব—সেখানেই ত প্রায় থাকেন।

আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তোমার বাবু ত মুসলমান, বৈষ্ণব-বৈরাগীরা তাদের আখড়ায় ওকে থাকতে দেবে কেন ?

নবীন রাগ করিয়া কহিল, ঐ সব আউল-বাউলগুলোর ধর্মাধর্ম জ্ঞান আছে নাকি ? ওরা জাত-জন্ম কিছুই মানে না, যে কেউ ওদের সঙ্গে মিশলেই ওরা দলে টেনে নেয়, বাছবিচার করে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সেবার যখন তোমাদের এখানে ছ'-সাত দিন ছিলাম তখন ত গহর ওদের কথা কিছুই বলে নি ?

নবীন বলিল, বললে যে কমললতার গুণাগুণ প্রকাশ হয়ে পড়তো। সে কয়দিন বাবুও অমনি খাতা কাগজ কলম নিয়ে আখড়ায় গিয়ে ঢুকলেন।

প্রশ্ন করিয়া করিয়া জানিলাম, দ্বারিক বাউল গান বাঁধিতে, ছড়া রচনা করিতে সিদ্ধহস্ত। গহর এই প্রলোভনে মজিয়াছে। তাহাকে কবিতা শুনায়, তাহাকে দিয়া ভুল সংশোধন করিয়া লয়। আর কমললতা একজন যুবতী বৈষ্ণবী—এই আখড়াতেই বাস করে। সে দেখিতে ভালো, গান গাহে ভালো, তাহার কথা শুনিলে লোকে মুগ্ধ হইয়া যায়। বৈষ্ণবীসেবায় গহর মাঝে মাঝে টাকাকড়ি দেয়, আখড়ার সাবেক প্রাচীর জীর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গিয়াছিল, গহর নিজ ব্যয়ে তাহা মেরামত করিয়া দিয়াছে। কাজটা তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকের অগোচরে সে গোপনে করিয়াছে।

ছেলেবেলায় এই আখড়ার কথা শুনিয়াছিলাম আমার মনে পড়িল। পুরাকালে মহাপ্রভুর কোন্ এক ভক্ত শিষ্য এই আখড়ার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদবধি শিষ্য-পরম্পরায় বৈষ্ণবেরা ইহাতে বাস করিয়া আসিতেছে।

অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, বলিলাম, নবীন, আখড়াটা আমাকে একবার দেখিয়ে দিতে পারবে ?

নবীন ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল, বলিল আমার অনেক কাজ। আর আপনিও ত এই দেশের মানুষ, চিনে যেতে পারবেন না? আধক্রোশের বেশি নয়, ঐ সুমুখের রাস্তা দিয়ে সিধে উত্তর-মুখো চলে গেলে আপনিই দেখতে পাবেন, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না। সামনে দীঘির পাড়ে বকুলতলায় বৃন্দাবনলীলা চলছে, দূর থেকেই আওয়াজ কানে যাবে—ভাবতে হবে না।

আমার যাওয়ার প্রস্তাবটা নবীন গোড়াতেই পছন্দ করে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হয় সেখানে—কীর্তন?

নবীন বলিল, হাঁ, দিনরাত খঞ্জনি কত্তালের কামাই নেই।

হাসিয়া বলিলাম, সে ভালোই নবীন। যাই গহরকে ধরে আনি গে।

এবার নবীন হাসিল, বলিল, হাঁ যান; কিন্তু দেখবেন, কমলিলতার কেত্তন শুনে নিজেই যেন আটকে যাবেন না।

দেখি কি হয়। এই বলিয়া হাসিয়া কমললতা বৈষ্ণবীর আখড়ার উদ্দেশে অপরাহ্ণ-বেলায় যাত্রা করিলাম!

আখড়ার ঠিকানা যখন মিলিল তখন সন্ধ্যা বোধ করি উত্তীর্ণ হইয়াছে, দূর হইতে কীর্তন বা খোল-করতালের শব্দমাত্র পাই নাই, সুপ্রাচীন বকুল বৃক্ষটা সহজেই চোখে পড়িল, নীচে ভাঙাচোরা বেদী একটা আছে, কিন্তু লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। একটা ক্ষীণ পথের রেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রাচীরের ধার ঘেঁষিয়া নদীর দিকে গিয়াছে, অনুমান করিলাম হয়ত ওদিকে কাহারও সন্ধান মিলিতে পারে, অতএব সেই দিকেই পা বাড়াইলাম। ভুল করি নাই, শীর্ণ সংকীর্ণ শৈবালাচ্ছন্ন নদীর তীরে একখণ্ড পরিষ্কৃত গোময়লিপ্ত ঈষদুচ্চ ভূমির উপরে বসিয়া গহর এবং আর এক ব্যক্তি—আন্দাজ করিলাম, ইনিই বৈরাগী দ্বারিকাদাস—আখড়ার বর্তমান অধিকারী। নদীর তীর বলিয়া তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয় নাই, বাবাজীকে বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম। লোকটিকে ভদ্র ও উচ্চ জাতির বলিয়াই মনে হইল। বর্ণ শ্যাম, রোগা বলিয়া কিছু দীর্ঘকায় বলিয়া চোখে ঠেকে; মাথার চুল চূড়ার মতো করিয়া সুমুখে বাঁধা, দাড়ি গোঁফ প্রচুর নয়—সামান্যই, চোখেমুখে একটা স্বাভাবিক হাসির ভাব আছে, বয়সটা ঠিক আন্দাজ করিতে পারিলাম না, তবে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশি হইবে বলিয়া বোধ করিলাম না। আমার আগমন বা উপস্থিতি উভয়ের কেহই লক্ষ্য করিল না, দু'জনেই নদীর পরপারে পশ্চিম দিগন্তে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে। সেখানে নানা রঙ ও নানা আকারের টুক্‌রা মেঘের মাঝে ক্ষীণ পাণ্ডুর তৃতীয়ার চাঁদ, এবং ঠিক যেন তাহারই কপালের মাঝখানে ফুটিয়া আছে অত্যুজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা। বহু নিম্নে দেখা যায় দূরে গ্রামান্তরের নীল বৃক্ষরাজি—তাহার যেন কোথাও আর শেষ নাই, সীমা নাই। কালো, সাদা, পাঁশুটে নানা বর্ণের ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘের গায়ে তখনও অস্তগত সূর্যের শেষ দীপ্তি খেলিয়া বেড়াইতেছে—ঠিক যেন দুষ্ট ছেলের হাতে রঙের তুলি পড়িয়া ছবির আদ্যশ্রাদ্ধ চলিতেছে। তাহার ক্ষণকালের আনন্দ চিত্রকর আসিয়া কান মলিয়া হাতের তুলি কাড়িয়া লইল বলিয়া।

স্বল্পতোয়া নদীর কতকটা অংশ বোধ করি গ্রামবাসীরা পরিষ্কৃত করিয়াছে, সম্মুখের সেই স্বচ্ছ, কালো অল্প পরিসর জলটুকুর উপরে ছোট ছোট রেখায় চাঁদের ও সন্ধ্যাতারার আলো পাশাপাশি পড়িয়া ঝিকমিক করিতেছে—যেন কষ্টিপাথরে ঘষিয়া স্যাকরা সোনার দাম যাচাই করিতেছে। কাছে কোথাও বনের মধ্যে বোধ করি অজস্র কাঠমল্লিকা ফুটিয়াছে, তাহারই গন্ধে সমস্ত বাতাসটা ভারী হইয়া উঠিয়াছে এবং নিকটে কোন গাছে অসংখ্য বকের বাসা হইতে শাবকগণের একটানা ঝুমঝুম শব্দ বিচিত্র মাধুর্যে অবিরাম কানে আসিয়া পশিতেছে। এ সবই ভালো এবং যে দুটা লোক তন্গত চিত্তে জড়ভরতের মত বসিয়া আছে তাহারাও কবি সন্দেহ নাই, কিন্তু এ দেখিতে এই জঙ্গলে সন্ধ্যাকালে আসি নাই, নবীন বলিয়াছিল একপাল বোষ্টুমী আছে এবং সকলের সেরা বোষ্টুমী কমললতা আছে। তাহারা কোথায় ?

ডাকিলাম, গহর !

গহর ধ্যান ভাঙিয়া হতবুদ্ধির মত আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, গোঁসাই, তোমার শ্রীকান্ত না ?

গহর দ্রুতবেগে উঠিয়া আমাকে সজোরে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল! তাহার আবেগ থামিতে চাহে না এমনি ব্যাপার ঘটিল। কোনমতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বসিয়া পড়িলাম,—বলিলাম, বাবাজী, আমাকে হঠাৎ চিনলেন কি করে ?

বাবাজী হাত নাড়িলেন—ও চলবে না গোঁসাই, ক্রিয়াপদের শেষের ঐ সম্ভ্রমের দন্ত্য 'ন'টি বাদ দিতে হবে! তবে ত রস জমবে।

বলিলাম, তা যেন দিলাম, কিন্তু হঠাৎ আমাকে চিনলে কি করে ?

বাবাজী কহিলেন হঠাৎ চিনবো কেন? তুমি যে আমাদের বৃন্দাবনের চেনা মানুষ গোঁসাই, তোমার চোখ দুটি যে রসের সমুদ্দুর—ও যে দেখলেই চোখে পড়ে। যেদিন কমললতা এলো—তারও এমনি দুটি চোখ—তারে দেখেই চিনলাম—কমললতা, কমললতা, এতদিন ছিলে কোথা? কমল এসে সেই যে আপনার হ'লো তার আর আদি-অন্ত বিরহ-বিচ্ছেদ রইল না। এই ত সাধনা গোঁসাই, একেই ত বলি রসের দীক্ষা।

বলিলাম, কমললতা দেখবো বলেই ত এসেছি গোঁসাই, কই সে ?

বাবাজী ভারি খুশি হইলেন, বলিলেন দেখবে তাকে? কিন্তু সে তোমার অচেনা নয় গোঁসাই, বৃন্দাবনে তাকে অনেকবার দেখেচো। হয়ত ভুলে গেছো, কিন্তু দেখলেই চিনবে সেই কমললতা। গোঁসাই, ডাকো না একবার তারে। এই বলিয়া বাবাজী গহরকে ডাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইঁহার কাছে সবাই গোঁসাই, বলিলেন, বলো গে শ্রীকান্ত এসেছে তোমাকে দেখতে।

গহর চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম, গোঁসাই, আমার কথা বুঝি তোমাকে গহর সমস্ত বলেচে ?

বাবাজী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হাঁ, সমস্ত বলেচে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, গোঁসাই, ছ'-সাত দিন আসো নি কেন? সে বললে, শ্রীকান্ত এসেছিল। তুমি যে

শীঘ্রই আবার আসবে তাও সে বলেচে। তুমি বর্মাদেশে যাবে তাও জানি।

শুনিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলাম, রক্ষা হোক, ভয় হইয়াছিল সত্যই বা ইনি কোন অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে আমাকে দেখিবামাত্রই চিনিয়াছেন। যাই হোক, এ ক্ষেত্রে আমার সম্বন্ধে তাঁহার আন্দাজটা যে বেঠিক হয় নাই তাহা মানিতেই হইবে।

বাবাজীকে ভালো বলিয়াই ঠেকিল, অন্ততঃ অসাধু প্রকৃতির বলিয়া মনে হইল না। বেশ সরল। কি জানি, কেন ইহাদের কাছে গহর আমার সকল কথাই বলিয়াছে—অর্থাৎ যতটুকু সে জানে। বাবাজী সহজেই তাহা স্বীকার করিলেন। একটু ক্ষ্যাপাটে গোছের—হয়ত কবিতা ও বৈষ্ণবীরসচর্চায় কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত।

অনতিকাল পরেই গহর গোঁসাইয়ের সঙ্গে কমললতা আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স ত্রিশের বেশি নয়, শ্যামবর্ণ, আঁটসাট ছিপছিপে গড়ন, হাতে কয়েক গাছি চুড়ি—হয়ত পিতলের, সোনার হইতেও পারে, চুল ছোট নয়, গেরো দেওয়া, পিঠের উপর ঝুলিতেছে, গলায় তুলসীর মালা, হাতে থলির মধ্যে তুলসীর জপমালা। ছাপ-ছোপের খুব বেশি আড়ম্বর নাই কিম্বা হয়ত সকালের দিকে ছিল, এ-বেলায় কিছু কিছু মুছিয়া গিয়াছে। ইহার মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলাম। সবিস্ময়ে মনে হইল এই চোখ-মুখের ভাবটা যেন পরিচিত এবং চলনের ধরনটাও যেন পূর্বে কোথাও দেখিয়াছি।

বৈষ্ণবী কথা কহিল। সে যে নীচের স্তরের লোক নয় তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম। সে কিছুমাত্র ভূমিকা করিল না, সোজা আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, কি গোঁসাই চিনতে পারো?

বলিলাম না; কিন্তু কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্চে।

বৈষ্ণবী কহিল, দেখেচো বৃন্দাবনে। বড়গোঁসাইজীর কাছে খবরটা শোন নি এখনো?

বলিলাম তা শুনেচি; কিন্তু বৃন্দাবনে আমি ত কখনো জন্মেও যাই নি।

বৈষ্ণবী কহিল, গ্যাছো বইকি। অনেক কালের কথা হঠাৎ স্মরণ হচ্চে না। সেখানে গরু চরাতে, ফল পেড়ে আনতে, বনফুলের মালা গেঁথে আমাদের গলায় পরাতে—সব ভুলে গেলে? এই বলিয়া সে ঠোঁট চাপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বুঝিলাম তামাসা করিতেছে; কিন্তু আমাকে না বড়গোঁসাইজীকে ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। কহিল রাত হয়ে আসচে আর জঙ্গলে বসে কেন? ভেতরে চলো।

বলিলাম জঙ্গলের পথে আমাদেরও অনেকটা যেতে হবে। বরঞ্চ কাল আবার আসবো।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, এখানের সংবাদ দিলে কে? নবীন?

হাঁ, সে-ই।

কমললতার খবর বলে নি ?

হাঁ, তা-ও বলেছে।

বোষ্টুমীর জাল ছিঁড়ে হঠাৎ বার হওয়া যায় না, তোমাকে সাবধান করে দেয় নি ?

সহাস্যে কহিলাম, হাঁ, তা-ও দিয়েচে।

বৈষ্ণবী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, নবীন হুঁশিয়ার মাঝি। তার কথা না শুনে ভাল কর নি।

কেন বলো ত ?

বৈষ্ণবী ইহার জবাব দিল না, গহরকে দেখাইয়া কহিল, গোসাই বলে, তুমি বিদেশে যাচ্চ চাকরি করতে। তোমার কেউ নেই, চাকরি করবে কেন ?

তবে কি করবো ?

আমরা যা করি। গোবিন্দজীর প্রসাদ কেউ ত আর কেড়ে নিতে পারবে না।

তা জানি, কিন্তু বৈরাগীগিরি আমার নতুন নয়।

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, তা বুঝেছি, ধাতে সয় না বুঝি ?

না, বেশিদিন সয় না।

বৈষ্ণবী মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, তোমার কমই ভাল। তবে এসো, ওদের সঙ্গে ভাব করিয়ে দিই। এখানে কমলের বন আছে।

তা শুনেচি, কিন্তু অন্ধকারে ফিরব কি করে ?

বৈষ্ণবী পুনশ্চ হাসিল, কহিল, অন্ধকারে ফিরতেই বা আমরা দেবো কেন ? অন্ধকার কাটবে গো কাটবে। এখন যেয়ো। এসো।

চলো।

বৈষ্ণবী কহিল, গোর। গোর!

গোর গোর, বলিয়া আমিও অনুসরণ করিলাম।

॥ দুই ॥

যদিচ ধর্মাচরণে নিজের মতিগতি নাই, কিন্তু যাহাদের আছে তাহাদেরও বিঘ্ন ঘটাই না। মনের মধ্যে নিঃসংশয়ে জানি ঐ গুরুতর বিষয়ের কোন সন্ধিসন্ধি আমি কোনকালে খুঁজিয়া পাইব না। তথাপি ধার্মিকদের আমি ভক্তি করি। বিখ্যাত স্বামীজী, স্বখ্যাত সাধুজী—কাহাকেও ছোট-বড় করি না, উভয়ের বাণীই আমার কর্ণে সমান মধু বর্ষণ করে।

বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি বাঙলা দেশের আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ় রহস্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েই সুগুপ্ত আছে, এবং সেইটাই নাকি বাঙলার নিজস্ব খাঁটি জিনিস। ইতিপূর্বে সন্ন্যাসী-সাধুসঙ্গ কিছু কিছু করিয়াছি, ফললাভের বিবরণ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু এবার যদি দৈবাৎ খাঁটি বস্তু কপালে জুটিয়া থাকে ত এ সুযোগ

ব্যর্থ হইতে দিব না সংকল্প করিলাম। পটুর বৌভাতের নিমন্ত্রণ আমাকে রাখিতেই হইবে, অন্ততঃ সে কয়টা দিন কলিকাতার নিঃসঙ্গ মেসের পরিবর্তে বৈষ্ণবী-আখড়ার আশেপাশে কোথাও কাটাইতে পারিলে আর যাই হোক, জীবনের সঞ্চয়ে বিশেষ লোকসান ঘটিবে না।

ভিতরে আসিয়া দেখিলাম কমললতার কথা মিথ্যা নয়, সেথায় কমলের বনই বটে, কিন্তু দলিত বিদলিত। মত্তহস্তিকুলের সাক্ষাৎ মিলিল না, কিন্তু বহু পদচিহ্ন বিদ্যমান। বৈষ্ণবীরা নানা বয়সের ও নানা চেহারার, এবং নানা কাজে ব্যাপৃত। কেহ দুধ জ্বাল দিতেছে, কেহ ক্ষীর তৈরী করিতেছে, কেহ নাড়ু পাকাইতেছে, কেহ ময়দা মাখিতেছে, কেহ ফলমূল বানাইতেছে—এ সকল ঠাকুরের রাত্রের ভোগের ব্যাপার। একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী বৈষ্ণবী একমনে বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে, এবং তাহারই কাছে বসিয়া আর একজন নানা রঙের ছোপানো ছোট ছোট বস্ত্রখণ্ড সযত্নে কুঞ্চিত করিয়া গুছাইয়া তুলিতেছে, সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীগোবিন্দজিউ কাল স্নানান্তে পরিধান করিবেন। কেহই বসিয়া নাই, তাহাদের কাজের আগ্রহ ও একাগ্রতা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। সকলেই আমার প্রতি চাহিয়া দেখিল, কিন্তু নিমেষমাত্র। কৌতূহলের অবসর নাই, ওষ্ঠাধর সকলেরই নড়িতেছে, বোধ হয় মনে মনে জপ চলিতেছে। এদিকে বেলা শেষ হইয়া দুই একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে শুরু করিয়াছে। কমললতা কহিল, চলো, ঠাকুর নমস্কার করে আসবে! কিন্তু, আচ্ছা—তোমাকে কি বলে ডাকবো বলো ত? নতুন গোঁসাই বলে ডাকলে হয় না?

বলিলাম, কেন হবে না? তোমাদের এখানে গহর পর্যন্ত যখন গহর গোঁসাই হয়েছে, তখন আমি ত অন্ততঃ বামুনের ছেলে; কিন্তু আমার নিজের নামটা কি দোষ করলে? তার সঙ্গেই একটা গোঁসাই জুড়ে দাও না।

কমললতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সে হয় না ঠাকুর, হয় না। ও নামটা আমার ধরতে নেই—অপরাধ হয়, এসো।

তা যাচ্ছি, কিন্তু অপরাধটা কিসের?

কিসের তা তোমার শুনে কি হবে? আচ্ছা মানুষ ত!

যে-বৈষ্ণবীটি মালা গাঁথিতেছিল সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই মুখ নীচু করিল।

ঠাকুরঘরে কালো-পাথর ও পিতলের রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি। একটি নয়, অনেক-গুলি। এখানেও জন পাঁচ-ছয় বৈষ্ণবী কাজে নিযুক্ত। আরতির সময় হইয়া আসিতেছে, নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই।

ভক্তিভরে যথারীতি প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। ঠাকুরঘরটি ছাড়া অন্য সব ঘরগুলিই মাটির কিন্তু সযত্ন-পরিচ্ছন্নতার সীমা নাই। বিনা আসনে কোথাও বসিতেই সংকোচ হয় না, তথাপি কমললতা পুবের বারান্দার একধারে আসন পাতিয়া দিল, কহিল, বস, তোমার থাকবার ঘরটা একটু গুছিয়ে দিয়ে আসি।

আমাকে এখানেই আজ থাকতে হবে নাকি?

কেন, ভয় কি ? আমি থাকতে তোমার কষ্ট হবে না।

বলিলাম, কষ্টের জন্য নয়, কিন্তু গহর রাগ করবে যে।

বৈষ্ণবী কহিল, সে ভার আমার। আমি ধরে রাখলে তোমার বন্ধু একটুও রাগ করবে না, এই বলিয়া সে হাসিয়া চলিয়া গেল।

একাকী বসিয়া অন্যান্য বৈষ্ণবীদের কাজ দেখিতে লাগিলাম। বাস্তবিকই তাহাদেব সময় নষ্ট করিবার সময় নাই, আমার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। মিনিট-দশেক পরে কমললতা যখন ফিরিয়া আসিল তখন কাজ শেষ করিয়া সকলে উঠিয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমিই মঠের কর্ত্রী নাকি ?

কমললতা জিব কাটিয়া কহিল আমরা সবাই গোবিন্দজীর দাসী—কেউ ছোট-বড় নেই। এক একজনের এক একটা ভার, আমার উপর প্রভু এই ভার দিয়াছেন, এই বলিয়া সে মন্দিরের উদ্দেশে হাতজোড় করিয়া কপালে হাত ঠেকাইল। বলিল এমন কথা আর কখনো মুখে এনো না।

বলিলাম, তাই হবে। আচ্ছা, বড়গোঁসাই, গহরগোঁসাই এঁদের দেখছি না কেন ?

বৈষ্ণবী কহিল, তাঁরা এলেন বলে। নদীতে স্নান করতে গেছেন।

এই রাত্রে ? আর ঐ নদীতে ?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ।

গহরও ?

হাঁ, গহরগোঁসাইও।

কিন্তু আমাকেই বা স্নান করালে না কেন ?

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, আমরা কাউকেই স্নান করাই নে, তারা আপনি করে। ঠাকুরের দয়া হলে তুমিও একদিন করবে, সেদিন মানা করলেও শুনবে না।

বলিলাম, গহর ভাগ্যবান, কিন্তু আমার ত টাকা নেই, আমি গরীব লোক, আমার প্রতি হয়ত ঠাকুরের দয়া হবে না।

বৈষ্ণবী ইঙ্গিতটা বোধ হয় বুঝিল, এবং রাগ করিয়া কি যেন একটা বলিতে গেল, কিন্তু বলিল না। তারপরে কহিল, গহরগোঁসাই যাই হোন, কিন্তু তুমিও গরীব নও। অনেক টাকা দিয়ে যে পরের কন্যাদায় উদ্ধার করে, ঠাকুর তাকে গরীব ভাবে না। তোমার ওপরেও দয়া হওয়া আশ্চর্য নয়।

বলিলাম, তা হলে সেটা ভয়ের কথা। তবু, কপালে যা লেখা আছে ঘটবে, আটকানো যাবে না—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কন্যাদায় উদ্ধারের খবর তুমি পেলে কোথায় ?

বৈষ্ণবী কহিল, আমাদের পাঁচ বাড়িতে ভিক্ষে করতে হয়, আমরা সব খবরই শুনতে পাই।

কিন্তু এ খবর বোধ হয় এখনো পাও নি যে, টাকা দিয়ে দায় উদ্ধার করতে আমার হয়নি ?

বৈষ্ণবী কিছু বিস্মিত হইল, না এ খবর পাই নি ; কিন্তু হ'লো কি, বিয়ে ভেঙ্গে গেলো ?

হাসিয়া কহিলাম, বিয়ে ভাঙ্গে নি, কিন্তু ভেঙ্গেছেন কালিদাসবাবু—বরের বাপ নিজে। পরের ভিক্ষের দানে ছেলে বেচে পণের কড়ি হাত পেতে নিতে তিনি লজ্জা পেলেন। আমিও বেঁচে গেলাম। এই বলিয়া ব্যাপারটা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। বৈষ্ণবী সবিস্ময়ে কহিল, বল কি গো, এ যে অঘটন ঘটলো।

বলিলাম, ঠাকুরের দয়া। শুধু কি গহরগোঁসাইজীই অন্ধকারে পচা নদীর জলে ডুব মারবে, আর সংসারের কোথাও কোন অঘটন ঘটবে না ? তাঁর লীলাই বা প্রকাশ পাবে কি করে বলো ত ? বলিয়াই কিন্তু বৈষ্ণবীর মুখ দেখিয়া বুঝিলাম কথাটা আমার ভালো হয় নাই—মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবী কিন্তু প্রতিবাদ করিল না, শুধু হাত তুলিয়া মন্দিরের উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে নমস্কার করিল। যেন অপরাধের মার্জনা ভিক্ষা করিল।

সম্মুখ দিয়া একজন বৈষ্ণবী মস্ত একথালা লুচি লইয়া ঠাকুরঘরের দিকে গেল। দেখিয়া কহিলাম, আজ তোমাদের সমারোহ ব্যাপার। বোধ হয় বিশেষ কোন পর্বদিন—না ?

বৈষ্ণবী কহিল, না, আজ কোন পর্বদিন নয়। এ আমাদের প্রতিদিনের ব্যাপার, ঠাকুরের দয়ায় অভাব কখনো ঘটে না।

কহিলাম, আনন্দের কথা, কিন্তু আয়োজনটা বোধ করি রাত্রেই বেশি করে করতে হয় ?

বৈষ্ণবী কহিল, তাও না। সেবার সকাল-সন্ধ্যা নেই, দয়া করে যদি দুদিন থাকো নিজেই সব দেখতে পাবে। দাসী আমরা, ওঁর সেবা করা ছাড়া সংসারে আর ত আমাদের কোন কাজ নেই। এই বলিয়া সে মন্দিরের দিকে হাতজোড় করিয়া আর একবার নমস্কার করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সারাদিন কি তোমাদের করতে হয় ?

বৈষ্ণবী কহিল, এসে যা দেখলে, তাই।

কহিলাম, এসে দেখলাম বাটনা বাটা, কুটনো কোটা, দুধ জ্বাল দেওয়া মালা গাঁথা, কাপড় রং করা—এমনি অনেক কিছু। তোমরা সারাদিন কি শুধু এই করো ?

বৈষ্ণবী কহিল, হাঁ, সারাদিন শুধু এই করি।

কিন্তু এসব ত কেবল ঘর-গৃহস্থালীর কাজ, সব মেয়েরাই করে। তোমরা ভজন-সাধন করো কখন ?

বৈষ্ণবী কহিল, এই আমাদের ভজন-সাধন।

এই রাঁধাবাড়া, জল-তোলা, কুট্‌নো-বাট্‌না, মালা-গাঁথা, কাপড়-ছাপানো—একেই বলো সাধনা ?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ, একেই বলি সাধনা। দাস-দাসীর এর চেয়ে বড় সাধনা আমরা পাব কোথায় গোঁসাই ? বলিতে বলিতে তাহার সজল চোখ দুটি যেন অনির্বচনীয়

মাধুর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমার হঠাৎ মনে হইল এই অপরিচিত বৈষ্ণবীর মুখের মত সুন্দর মুখ আমি সংসারে কখনো দেখি নাই। বলিলাম, কমললতা, তোমার বাড়ি কোথায়?

বৈষ্ণবী আঁচলে চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিল, গাছতলায়।

কিন্তু গাছতলা ত আর চিরকাল ছিল না?

বৈষ্ণবী কহিল, তখন ছিল ইঁট-কাঠের তৈরী কোন এক বাড়ির ছোট একটি ঘর; কিন্তু সে গল্প করার ত এখন সময় নেই গোঁসাই। এসো ত আমার সঙ্গে, তোমার নূতন ঘরটি দেখিয়ে দিই।

চমৎকার ঘরখানি। বাঁশের আলনায় একটি পরিষ্কার তসরের কাপড় দেখাইয়া দিয়া কহিল, ঐটি প'রে ঠাকুরঘরে এসো। দেরি ক'রো না যেন। এই বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া গেল।

একধারে ছোট একটি তক্তপোষে পাতা বিছানা। নিকটেই জলচৌকির উপরে রাখা কয়েকখানি গ্রন্থ ও একথালা বকুল ফুল; এইমাত্র প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ বোধহয় ধূপধুনা দিয়া গিয়াছে, তাহার গন্ধ ও ধুঁয়ায় ঘরটি তখনও পূর্ণ হইয়া আছে—ভারি ভালো লাগিল। সারাদিনের ক্লান্তি ত ছিলই, ঠাকুর-দেবতাকেও চিরদিন পাশ কাটাইয়া চলি, সুতরাং ওদিকের আকর্ষণ ছিল না—কাপড় ছাড়িয়া ঝুপ্ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। কি জানি এ কাহার ঘর, কাহার শয্যা; অজ্ঞাত বৈষ্ণবী একটা রাত্রির জন্য আমাকে ধার দিয়া গেল -কিম্বা হয়ত, এ তাহার নিজেরই—কিন্তু এ সকল চিন্তায় মন আমার স্বভাবতই ভারি সংকোচ বোধ করে, অথচ আজ কিছু মনেই হইল না, যেন কতকালের পরিচিত আপনার জনের কাছে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছি। বোধ হয় একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম, কে যেন দ্বারের বাহিরে ডাক দিল, নতুন-গোঁসাই, মন্দিরে যাবে না? ওঁরা তোমাকে ডাকচেন যে।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। মন্দিরা সহযোগে কীর্তন গান কানে গেল, বহু-লোকের সমবেত কোলাহল নয়, গানের কথাগুলি যেমন মধুর তেমনি সুস্পষ্ট। বামাকণ্ঠ রমণীকে চোখে না দেখিয়াও নিঃসন্দেহে অনুমান করিলাম এ কমললতা। নবীনের বিশ্বাস এই মিষ্ট স্বরই তাহার প্রভুকে মজাইয়াছে। মনে হইল অসম্ভব নয় এবং অত্যন্ত অসঙ্গতও নয়।

মন্দিরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে একধারে গিয়া বসিলাম; কেহ চাহিয়া দেখিল না। সকলের দৃষ্টিই রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির প্রতি নিবদ্ধ। মাঝখানে দাড়াইয়া কমললতা কীর্তন করিতেছে—মদনগোপাল জয় জয় যশোদাদুলাল কি, যশোদাদুলাল জয় জয় নন্দদুলাল কি। নন্দদুলাল জয় জয় গিরিধারীলাল কি, গিরিধারীলাল জয় জয় গোবিন্দ গোপাল কি।

এই সহজ সাধারণ গুটিকয়েক কথার আলোড়নে ভক্তের বক্ষঃস্থল গম্ভীরভাবে মথিত করিয়া কি সুধা তরঙ্গিত হইয়া উঠে তাহা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন, কিন্তু দেখিতে পাইলাম উপস্থিত কাহারও চক্ষুই শুষ্ক নয়। গায়িকার দুই চক্ষু

প্লাবিত করিয়া দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে এবং ভাবের গুরুভারে তাহার কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল বলিয়া। এই সকল রসের রসিক আমি নই, কিন্তু আমারও মনের ভিতরটা হঠাৎ যেন কেমনধারা করিয়া উঠিল। বাবাজী দ্বারিকদাস মুদ্রিত নেত্রে একটা দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি সচেতন কি অচেতন বুঝা গেল না, এবং শুধু কেবল ক্ষণকাল পূর্বেই স্নিগ্ধহাস্য-পরিহাস-চঞ্চল কমললতাই নয়, সাধারণ গৃহকর্মে নিযুক্তা যে সকল বৈষ্ণবীদের এইমাত্র সামান্য তুচ্ছ কুরূপা মনে হইয়াছিল, তাহারাও যেন এই ধূপ ও ধুনায় ধূমাচ্ছন্ন গৃহের অনুজ্জ্বল দীপালোকে আমার চক্ষে মুহূর্তকালের জন্য অপরূপ হইয়া উঠিল। আমারও যেন মনে হইতে লাগিল অদূরবর্তী ঐ পাথরের মূর্তি সত্যই চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে এবং কান পাতিয়া কীর্তনের সমস্ত মাধুর্য উপভোগ করিতেছে।

ভাবের এই বিহ্বল মুগ্ধভাবকে আমি অত্যন্ত ভয় করি, ব্যস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম—কেহ লক্ষ্যও করিল না। দেখি প্রাঙ্গণের একধারে বসিয়া গহর। কোথাকার একটা আলোর রেখা আসিয়া তাহার গায়ে পড়িয়াছে। আমার পদশব্দে তাহার ধ্যান ভাঙিল না, কিন্তু সেই একান্ত সমাহিত মুখের প্রতি চাহিয়া আমিও নড়িতে পারিলাম না, সেইখানে স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। মনে হইতে লাগিল শুধু আমাকেই একাকী ফেলিয়া রাখিয়া এ-বাড়ির সকলেই যেন আর এক দেশে চলিয়া গিয়াছে—সেখানকার পথ আমি চিনি না। ঘরে আসিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম। নিশ্চয় জানি, জ্ঞান বিদ্যা ও বুদ্ধিতে আমি ইঁহাদের সকলের বড়, তথাপি কিসের ব্যথায় জানি না, মনের ভিতরটা কাঁদিতে লাগিল এবং তেমনই অজানা কারণে চোখের কোণ বাহিয়া বড় বড় ফোঁটায় জল গড়াইয়া পড়িল।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, কানে গেল, ওগো নতুন-গোঁসাই?

জাগিয়া উঠিয়া বসিলাম—কে?

আমি গো—তোমার সন্ধ্যেবেলার বন্ধু। এতো ঘুমোতেও পারো।

অন্ধকার ঘরে চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া কমললতা বৈষ্ণবী।

বলিলাম, জেগে থেকে লাভ হ'তো কি? তবু সময়টার একটু সদ্ব্যবহার হ'লো।

তা জানি; কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ পাবে না?

পাবো।

তবে ঘুমুচ্চো যে বড়?

জানি বিঘ্ন ঘটবে না, প্রসাদ পাবোই। আমার সন্ধ্যেবেলাকার বন্ধু রাত্রেও পরিত্যাগ করবে না।

বৈষ্ণবী সহাস্যে কহিল, সে দাবি বৈষ্ণবের, তোমাদের নয়।

বলিলাম, আশা পেলে বোষ্টম হতে কতক্ষণ? তুমি গহরকে পর্যন্ত গোঁসাই বানিয়েছ, আর আমিই কি এত অবহেলার? হুকুম করলে বোষ্টমের দাসানুদাস হতেও রাজি।

কমললতার কণ্ঠস্বর একটুখানি গম্ভীর হইল, কহিল, বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে তামাসা করতে নেই গোঁসাই, অপরাধ হয়। গহরগোঁসাইজীকেও তুমি ভুল বুঝেছো। তার আপন লোকেরাও তাকে কাফের বলে, কিন্তু তারা জানে না সে খাঁটি মুসলমান, বাপ-পিতামহর ধর্মবিশ্বাস সে ত্যাগ করে নি।

কিন্তু তার ভাব দেখে ত তা মনে হয় না?

বৈষ্ণবী কহিল, সেইটেই আশ্চর্য। কিন্তু আর দেরি ক'রো না, এসো। একটু ভাবিয়া কহিল, কিম্বা প্রসাদ না হয় তোমাকে এখানেই দিয়ে যাই—কি বলো?

বলিলাম, আপত্তি নেই, কিন্তু গহর কোথায়? সে থাকে ত দু'জনকে একত্রেই দাও না।

তার সঙ্গে বসে খাবে?

বলিলাম, চিরকালই ত খাই। ছেলেবেলায় ওর মা আমাকে অনেক ফলার মেখে দিয়েছে, তোমাদের চেয়ে সে তখন কম মিষ্টি হতো না। তা ছাড়া গহর ভক্ত, গহর কবি—কবির জাতের খোঁজ করতে নেই।

অন্ধকারেও মনে হইল বৈষ্ণবী একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিল, তারপরে কহিল, গহরগোঁসাইজী নেই, কখন চলে গেছে আমরা জানতে পারিনি।

কহিলাম, গহরকে দেখলাম সে উঠানে বসে। তাকে কি ভেতরে যেতে দাও না?

বৈষ্ণবী কহিল, না।

বলিলাম, গহরকে আজ আমি দেখেছি। কমললতা, আমার তামাসাতে তুমি রাগ করিলে, কিন্তু তোমাদের ঠাকুরের সঙ্গে তোমরাও বড় কম তামাসা করচো না। অপরাধ শুধু একটা দিকেই হয় তা নয়।

বৈষ্ণবী এ অনুযোগের আজ জবাব দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল। অল্প একটুখানি পরেই সে অন্য একটি বৈষ্ণবীর হাতে আলো ও আসন এবং নিজে প্রসাদের পাত্র লইয়া প্রবেশ করিল, কহিল অতিথিসেবার ত্রুটি হবে নতুনগোঁসাই, কিন্তু এখানকার সমস্তই ঠাকুরের প্রসাদ।

হাসিয়া বলিলাম, ভয় নাই গো সন্ধ্যার বন্ধু বোষ্টম না হয়েও তোমার নতুন গোঁসাইজীর রসবোধ আছে, আতিথ্যের ত্রুটি নিয়ে সে রসভঙ্গ করে না। রাখো কি আছে—ফিরে এসে দেখবে প্রসাদের কণিকাটুকুও অবশিষ্ট নেই।

ঠাকুরের প্রসাদ অমনি ক'রেই ত খেতে হয়। এই বলিয়া কমললতা নীচে ঠাঁই করিয়া সমুদয় খাদ্যসামগ্রী একে একে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিল।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই ঘুম ভাঙিয়া গেল কাঁসর-ঘণ্টার বিকট শব্দে। সুবিপুল বাদ্যভাণ্ড সহযোগে মঙ্গল আরতি শুরু হইয়াছে। কানে গেল ভোরের সুরে কীর্তনের পদ—কানু গলে বনমালা বিরাজে, রাই গলে মোতি সাজে। অরুণিত চরণে, মঞ্জরী রঞ্জিত খঞ্জন গঞ্জন লাজে। তারপরে সারাদিন ধরিয়া চলিল ঠাকুরসেবা। পূজা-পাঠ কীর্তন, নাওয়ানো, খাওয়ানো, গামোছানো, চন্দন-মাখানো, মালা-পরানো—ইহার

আর বিরাম-বিচ্ছেদ নাই। সবাই ব্যস্ত, সবাই নিযুক্ত। মনে হইল পাথরের দেবতারই এই অষ্ট-প্রহরব্যাপী অফুরন্ত সেবা সহে, আর কিছু হইলে এত বড় ধকলে কবে ক্ষয় হইয়া নিঃশেষ হইয়া যাইত।

কাল বৈষ্ণবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমরা সাধন-ভজন করো কখন? সে উত্তরে বলিয়াছিল—এই ত সাধন-ভজন। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এই রাঁধাবাড়া ফুল-তোলা মালা-গাঁথা দুধ জ্বাল দেওয়া একেই বলো সাধনা? সে মাথা নাড়িয়া তখনি জবাব দিয়া বলিয়াছিল, হাঁ, আমরা একেই বলি সাধনা—আমাদের আর কোন সাধন-ভজন নেই।

আজ সমস্ত দিনের কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলাম তাহার কথাগুলো বর্ণে বর্ণে সত্য। অতিরঞ্জন অত্যুক্তি কোথাও নাই দুপুরবেলায় কোন এক ফাঁকে বলিলাম, কমললতা, আমি জানি তুমি অন্য সকলের মত নও। সত্যি বলো ত, ভগবানের প্রতীক এই যে পাথরের মূর্তি—

বৈষ্ণবী হাত তুলিয়া আমাকে থামাইয়া দিল, কহিল, প্রতীক কী গো—উনিই যে সাক্ষাৎ ভগবান। এমন কথা আর কখনো মুখেও এনো না নতুনগোসাই—

আমার কথায় সে-ই যেন লজ্জা পাইল বেশি। আমিও কেমন একপ্রকার অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, তবুও আস্তে আস্তে বলিলাম, আমি তো জানি নে, তাই জিজ্ঞাসা করচি তোমরা কি সত্যই ভাবো, ঐ পাথরের মূর্তির মধ্যেই ভগবানের শক্তি এবং চৈতন্য, তাঁর –

আমার এ কথাটাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, সে বলিয়া উঠিল, ভাবতে যাবো কিসের জন্যে গো, এ যে আমাদের প্রত্যক্ষ। সংস্কারের মোহ তোমরা কাটাতে পারো না বলেই ভাবো রক্তমাংসের দেহ ছাড়া চৈতন্যের আর কোথাও থাকবার যো নেই; কিন্তু তা কেন? আর এও বলি, শক্তি আর চৈতন্যের হদিস কি তোমরাই সবখানি পেয়ে বসে আছো যে বলবে পাথরের মধ্যে তার জায়গা হবে না? হয় গো হয়, ভগবানেরও কোথাও থাকতে বাধা পড়ে না, নইলে তাঁকে ভগবান বলতে যাবো কেন বলো ত?

যুক্তি হিসাবে কথাগুলো স্পষ্টও নয়, পূর্ণও নয়, কিন্তু এত তা নয়, এ তাহার জীবন্ত বিশ্বাস। তাহার সেই জোর ও অকপট উক্তির কাছে হঠাৎ কেমনধারা থতমত খাইয়া গেলাম; তর্ক করিতে, প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না, ইচ্ছাও করিল না। বরঞ্চ ভাবিলাম, সত্যই ত, পাথরই হোক আর যাই হোক, এমন পরিপূর্ণ বিশ্বাসে আপনাকে একান্ত সমর্পণ না করিতে পারিলে বৎসরের পর বৎসর দিনান্তব্যাপী এই অবিচ্ছিন্ন সেবার জোর পাইত ইহারা কি করিয়া? এমন সোজা হইয়া নিশ্চিন্ত নির্ভরে দাঁড়াইবার অবলম্বন মিলিত কোথায়? ইহারা শিশু ত নয়, ছেলেখেলার এই মিথ্যা অভিনয়ে দ্বিধাগ্রস্ত মন যে শান্তির অবসাদে দুদিনেই এলাইয়া পড়িত; কিন্তু সে হয় নাই, বরঞ্চ ভক্তি ও প্রীতির অখন্ড একাগ্রতায় আত্মনিবেদনের আনন্দোৎসব ইহাদের বাড়িয়াই চলিয়াছে। এ জীবনের পাওয়ার দিক দিয়া সে কি তবে সবই ভুয়া, সবই ভুল, সবই আপনাকে ঠকানো!

বৈষ্ণবী কহিল, কি গোঁসাই, কথা কও না যে?

বলিলাম, ভাবচি।

কাকে ভাবচো?

ভাবচি তোমাকেই।

ইস্। বড় সৌভাগ্য যে আমার! একটু পরে কহিল, তবুও থাকতে চাও না, কোথায় কোন্ বর্মাদের দেশে চাকরি করতে যেতে চাও। চাকরি করবে কেন?

বলিলাম, আমার ত মঠের জমিজমাও নেই, মুগ্ধ ভক্তের দলও নেই—খাবো কি?

ঠাকুর দেবেন।

কহিলাম, অত্যন্ত দুরাশা; কিন্তু তোমাদেরও যে ঠাকুরের ওপর খুব ভরসা তাও ত মনে হয় না। নইলে ভিক্ষে করতে যাবে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, যাই তিনি দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দোরে দোরে দাঁড়িয়ে থাকেন বলে। নইলে নিজেদের গরজ নেই, থাকলে যেতুম না, না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও না।

কমললতা তোমার দেশ কোথায়?

কালকেই ত বলেছি গোঁসাই, ঘর আমার গাছতলায়, দেশ আমার পথে পথে।

তাহলে গাছতলায় আর পথে পথে না থেকে মঠে থাকো কিসের জন্যে?

অনেকদিন পথে পথেই ছিলুম গোঁসাই, সঙ্গী পাই ত আবার একবার পথই সম্বল করি!

বলিলাম, তোমার সঙ্গীর অভাব এ কথা ত বিশ্বাস হয় না কমললতা। যাকে ডাকবে সেই যে রাজি হবে।

বৈষ্ণবী হাসিমুখে কহিল, তোমাকে ডাকচি নতুনগোঁসাই—রাজি হবে?

আমিও হাসিলাম, বলিলাম, হাঁ রাজি। নাবালক অবস্থায় যে লোক যাত্রার দলকে ভয় করে নি, সাবালক অবস্থায় তার বোষ্টুমীকে ভয় কি?

যাত্রার দলেও ছিলে নাকি?

হাঁ।

তাহলে ত গান গাইতেও পারো!

না, অধিকারী অতটা দূর এগোতে দেয় নি, তার আগেই জবাব দিয়েছিল। তুমি অধিকারী হলে কি হ'তো বলা যায় না।

বৈষ্ণবী হাসিতে লাগিল, বলিল, আমিও জবাব দিতুম। সে যাক, এখন আমাদের একজন জানলেই কাজ চলে যাবে। এদেশে যেমন-তেমন করেও ঠাকুরের নাম দিতে পারলে ভিক্ষের অভাব হয় না। চলো না গোঁসাই, বেরিয়ে পড়া যাক। বলছিলে শ্রীবৃন্দাবনধাম কখনো দেখো নি, চলো তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। অনেকদিন ঘরে বসে কাটলো, পথের নেশা আবার যেন টানতে চায়। সত্যি, যাবে নতুনগোঁসাই?

হঠাৎ তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভারি বিস্ময় জন্মিল, কহিলাম পরিচয় ত এখনো আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা পার হয় নি, আমাকে এতোটা বিশ্বাস হ'লো কি করে?

বৈষ্ণবী কহিল, চব্বিশ ঘণ্টা ত কেবল এক পক্ষেই নয় গোঁসাই, ওটা দু'পক্ষেই।

আমার বিশ্বাস পথে-প্রবাসে আমাকেও তোমার অবিশ্বাস হবে না। কাল পঞ্চমী, বেরিয়ে পড়বার ভারি শুভদিন—চলো। আর পথের ধারে রেলের পথ ত রইলই—ভালো না লাগে ফিরে এস, আমি বারণ করব না।

একজন বৈষ্ণবী আসিয়া খবর দিল—ঠাকুরের প্রসাদ ঘরে দিয়ে আসা হয়েছে।

কমললতা বলিল, চলো তোমার ঘরে গিয়ে বসিগে।

আমার ঘর? তাই ভালো।

আর একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। এবার আর সন্দেহের লেশমাত্র রহিল না যে সে পরিহাস করিতেছে না। আমি যে মাত্র উপলক্ষ্য তাহাও কিন্তু যে কারণেই হোক এখানের বাঁধন ছিঁড়িয়া এই মানুষটি পলাইতে পারিলে যেন বাঁচে—তাহার একমুহূর্তও বিলম্ব সহিতেছে না।

ঘরে আসিয়া খাইতে বসিলাম। অতি পরিপাটি প্রসাদ—পলায়নের ষড়যন্ত্রটা জমিত ভালো, কিন্তু কে একজন অত্যন্ত জরুরী কাজে কমললতাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। সুতরাং একাকী মুখ বুজিয়াই সেবা সমাপ্ত করিতে হইল। বাহিরে আসিয়া কাহাকেও বড় দেখিতে পাইলাম না, বাবাজী দ্বারিকাদাসই বা গেলেন কোথায়? দুই-চারিজন প্রাচীন বৈষ্ণবী ঘোরাঘুরি করিতেছে—কাল সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে ধোঁয়ার ঘোরে ইহাদেরই বোধ হয় অপ্সরা মনে হইয়াছিল, কিন্তু আজ দিনের বেলায় কড়া আলোতে কল্যকার সেই অধ্যাত্ম সৌন্দর্য বোধটা তেমন অটুট রহিল না, গা-টা কেমনতর করিয়া উঠিল, সোজা আশ্রমের বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সেই শৈবালাচ্ছন্ন শীর্ণকায়া মন্দ-স্রোতা সুপরিচিত স্রোতস্বতী এবং সেই লতাগুল্মকণ্টকাকীর্ণ তটভূমি, এবং সেই সর্পসঙ্কুল সুদৃঢ় বেতসকুঞ্জ ও সুবিস্তৃত বেণুবন। দীর্ঘকালের অনভ্যাসবশতঃ গা ছম ছম করিতে লাগিল, অন্যত্র যাইবার উপক্রম করিতেছি, কোথাও একটি লোক আড়ালে বসিয়াছিল, উঠিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমটা আশ্চর্য হইলাম এ জায়গাতেও মানুষ থাকে। লোকটির বয়স হয়ত আমাদের মতো—আবার বছর-দশেক বেশি হওয়াও বিচিত্র নয়। খর্বাকৃতি রোগা গড়ন, গায়ের রং-টা খুব কালো নয় বটে, কিন্তু মুখের নীচের দিকটা যেমন অস্বাভাবিক রকমের ছোট চোখে ভ্রূ দুটোও তেমনি অস্বাভাবিক রকমের দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিস্তীর্ণ। বস্তুতঃ এত বড় ঘন মোটা ভুরু যে মানুষের হয়, ইতিপূর্বে এ জ্ঞান আমার ছিল না, দূরে হইতে সন্দেহ হইয়াছিল, হয়ত প্রকৃতির কোন হাস্যকর খেয়ালে একজোড়া মোটা গোঁফ ঠোঁটের বদলে লোকটার কপালে গজাইয়াছে। গলাজোড়া মোটা তুলসীর মালা, পোষাক-পরিচ্ছদও অনেকটা বৈষ্ণবদের মতো কিন্তু যেমন ময়লা তেমনি জীর্ণ।

মশাই?

থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, আজ্ঞা করুন।

আপনি এখানে কবে এসেছেন শুনতে পারি কি?

পারেন। এসেছি কাল বৈকালে।

রাত্তিরে আখড়াতে ছিলেন বুঝি?

হাঁ, ছিলাম।

ওঃ!

মিনিটখানেক নীরবে কাটিল। পা বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লোকটা বলিল, আপনি ত বোষ্টম নয়—ভদ্রলোক—আখড়ার মধ্যে আপনাকে থাকতে দিলে যে!

বলিলাম, সে খবর তাঁরাই জানেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করবেন।

ওঃ! কম্‌লিলতা থাকতে বললে বুঝি?

হাঁ!

ওঃ! জানেন ওর আসল নাম কি? উষাঙ্গিনী। বাড়ি সিলেটে, কিন্তু দেখায় যেন কলকাতার মেয়েমানুষ। আমার বাড়িও সিলেটে। গাঁয়ের নাম মামুদপুর। শুনবেন ওর স্বভাব-চরিত্র?

বলিলাম না। কিন্তু লোকটার ভাবগতিক দেখিয়া এবার সত্যই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। প্রশ্ন করিলাম, কমললতার সঙ্গে আপনার কি কোন সম্বন্ধ আছে?

আছে না?

কি সেটা?

লোকটা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল, কেন, মিথ্যে নাকি? ও আমার পরিবার হয়। ওর বাপ নিজে থেকে আমাদের কণ্ঠিবদল করিয়েছিল, তার সাক্ষী আছে।

কেন জানি না, আমার বিশ্বাস হইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কি জাত?

আমরা দ্বাদশ-তিলি।

আর, কমললতা?

প্রত্যুত্তরে লোকটা তাহার সেই মোটা দ্রু-জোড়া ঘৃণায় কুঞ্চিত করিয়া বলিল, ওরা শুঁড়ী, ওদের জলে আমরা পা ধুই নে। একবার ডেকে দিতে পারেন?

না! আখড়াই সবাই যেতে পারে, ইচ্ছা হলে আপনিও পারেন।

লোকটা রাগ করিয়া বলিল, যাবো মশাই, যাবো। দারোগাকে দু-পয়সা খাইয়ে রেখেছি, পেয়াদা সঙ্গে ক'রে একবারে ঝুঁটি ধরে টেনে বার করে আনবো। বাবাজীর বাবাও রাখতে পারবে না। শালা রাস্কেল কোথাকার!

আর বাক্যব্যয় না করিয়া চলিতে লাগিলাম। লোকটা পিছন হইতে কর্কশকণ্ঠে কহিল, তাতে আপনার কি হ'লো? গিয়ে একবার ডেকে দিলে কি শরীর ক্ষয়ে যেতো নাকি? ওঃ—ভদ্দরলোক।

আর ফিরিয়া চাহিতে ভরসা হইল না। পাছে রাগ সামলাইতে না পারি এবং এই অতি দুর্বল লোকটার গায়ে হাত দিয়া ফেলি এবং ভয়ে একটু দ্রুতপদেই প্রস্থান করিলাম। মনে হইতে লাগিল, বৈষ্ণবীর পলাইবার হেতুটা বোধহয় এইখানেই কোথাও জড়িত।

মনটা বিগড়াইয়াছিল, ঠাকুরঘরে নিজেও গেলাম না, কেহ ডাকিতেও আসিল না। ঘরের মধ্যে একখানি জলচৌকির উপরে গুটিকয়েক বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী সযত্নে সাজানো

ছিল, তাহারি একখানা হাতে করিয়া প্রদীপটা শিয়রের কাছে আনিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। বৈষ্ণব-ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য নয়। শুধু সময় কাটাইবার জন্য। ক্ষোভের সহিত একটা কথা বার বার মনে হইতেছিল, কমললতা সেই যে গিয়াছে আর আসে নাই। ঠাকুরের সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইল, তাহার মধুর কণ্ঠ বার বার কানে আসিতে লাগিল, এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেই কথাটাই মনে হইতে লাগিল কমললতা সেই অবধি কোন তত্ত্বই আমার লয় নাই। আর সেই ভ্রূ-ওয়ালা লোকটা কোন সত্যই কি তাহার অভিযোগের মধ্যে নাই?

আরও একটা কথা। গহর কৈ? সে-ও ত আজ আমার খোঁজ লইল না ভাবিয়াছিলাম দিনকয়েক এখানেই কাটাইব, পুটুর বিবাহের দিনটি পর্যন্ত—সে আর হয় না। হয়ত কালই কলকাতায় রওনা হইয়া পড়িব।

ক্রমশঃ আরতি ও কীর্তন সমাপ্ত হইল। কল্যকার সেই বৈষ্ণবী আসিয়া আজও বহু যত্নে প্রসাদ রাখিয়া গেল, কিন্তু যে জন্য পথ চাহিয়াছিলাম, তাহার দেখা মিলিল না। বাহিরে লোকজনের কথাবার্তা, আনাগোনার পায়ের শব্দ ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিল, তাহার আসিবার কোন সম্ভাবনাই আর নাই জানিয়া আহার করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া দীপ নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

বোধ করি তখন অনেক রাত্রি, কানে গেল—নতুনগোঁসাই?

জাগিয়া উঠিয়া বসিলাম। অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া কমললতা; আস্তে আস্তে বলিল, আসি নি বলে মনে মনে বোধ হয় অনেক দুঃখ করেছো না গোঁসাই?

বলিলাম, হাঁ, করেচি।

বৈষ্ণবী মুহূর্তকাল নীরব হইয়া রহিল, তারপর বলিল, বনের মধ্যে ও লোকটা তোমাকে কি বলছিল?

তুমি দেখেছিলে নাকি?

হাঁ।

বলছিলো সে তোমার স্বামী—অর্থাৎ, তোমাদের সামাজিক আচারমতে তুমি তার কন্ঠিবদল-করা পরিবার।

তুমি বিশ্বাস করেছো?

না, করি নি।

বৈষ্ণবী আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, সে আমার স্বভাবচরিত্রের ইঙ্গিত করে নি?

করেছে।

আমার জাত?

হাঁ, তাও?

বৈষ্ণবী একটুখানি থামিয়া বলিল, শুনবে আমার ছেলেবেলার ইতিহাস? কিন্তু হয়ত তোমার ঘৃণা হবে।

বলিলাম, তবে থাক, ও আমি শুনতে চাইনে।

কেন ?

বলিলাম, তাতে লাভ কি কমললতা ? তোমাকে আমার ভারি ভালো লেগেছে ; কিন্তু কাল চলে যাবো, হয়ত আর কখনো আমাদের দেখাও হবে না। নিরর্থক আমার সেই ভাল লাগাটুকু নষ্ট করে ফেলে ফল কি হবে বলো ত ?

বৈষ্ণবী এবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া সে কি করিতেছে ভাবিয়া পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ভাবচো ?

ভাবচি, কাল তোমাকে যেতে দেবো না।

তবে কবে যেতে দেবে ?

যেতে কোনদিনই দেবো না ; কিন্তু অনেক রাত হ'লো, ঘুমোও। মশারিটা ভাল করে গোঁজা আছে ত ?

কি জানি, আছে বোধ হয়।

বৈষ্ণবী হাসিয়া কহিল, আছে বোধ হয় ? বাঃ—বেশ ত ! এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া অন্ধকারেই হাত বাড়াইয়া বিছানার সকল দিক পরীক্ষা করিয়া বলিল, ঘুমোও গোঁসাই—আমি চললুম। এই বলিয়া সে পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেল, এবং বাহির হইতে অত্যন্ত সাবধানে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

॥ তিন ॥

আজ আমাকে বৈষ্ণবী বার বার করিয়া শপথ করাইয়া লইল তাহার পূর্ব বিবরণ শুনিয়া আমি ঘৃণা করিব কিনা।

বলিলাম, শুনতে আমি চাই নে, কিন্তু শুনলেও আমি ঘৃণা করব না।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, কিন্তু করবে না কেন ? সে শুনলে মেয়ে-পুরুষে সবাই ত ঘৃণা করে।

বলিলাম, তুমি কি বলবে আমি জানি নে কিন্তু তবুও আন্দাজ করতে পারি। সে শুনলে মেয়েরাই যে মেয়েদের সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে সে জানি, এবং তার কারণও জানি, কিন্তু তোমাকে বলতে আমি চাইনে। পুরুষেরাও করে কিন্তু অনেক সময় সে ছলনা, অনেক সময়ে আত্মবঞ্চনা। তুমি যা বলবে তার চেয়েও অনেক কুশ্রী কথা আমি তোমাদের নিজের মুখেও শুনেচি, চোখেও দেখেচি ; কিন্তু তবুও ঘৃণা হয় না।

কেন হয় না ?

বোধ হয় আমার স্বভাব ; কিন্তু কালই ত বলেচি তোমাকে, তার দরকার নেই। শুনতে আমি একটুও উৎসুক নই। তা ছাড়া কোথাকার কে—সে-সব কাহিনী নাই বা আমাকে বললে।

বৈষ্ণবী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা গোঁসাই, তুমি পূর্বজন্ম পরজন্ম এসব বিশ্বাস করো ?

না।

না কেন? এ কি সত্যিই নেই তুমি ভাবো?

আমার ভাবনার অন্য জিনিস আছে, এসব ভাববার বোধ হয় সময় পেয়ে উঠি নে।

বৈষ্ণবী আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, একটা ঘটনা তোমাকে বলব, বিশ্বাস করবে? ঠাকুরের দিকে মুখ ক'রে বলচি তোমাকে মিথ্যে বলব না।

হাসিয়া কহিলাম, করব গো কমললতা, করব। ঠাকুরের দিব্যি না করে বললেও তোমাকে বিশ্বাস করব।

বৈষ্ণবী কহিল, তবে বলি। একদিন গহরগোঁসাইয়ের মুখে শুনলাম হঠাৎ তাঁর পাঠশালার বন্ধু এসেছিলেন বাড়িতে। ভাবলুম, যে লোক একটা দিন আমাদের এখানে না এসে পারে না, সে রইলো কোন্ ছেলেবেলার বন্ধুকে নিয়ে মেতে ছ'-সাত দিন! আবার ভাবলুম, এ কেমনধারা বামুন-বন্ধু যে অনায়াসে পড়ে রইলো মুসলমানের ঘরে, কারও ভয় করলে না, তার কি কোথাও কেউ নেই নাকি? জিজ্ঞাসা করতে গহরগোঁসাইও ঠিক একই কথাই বললে। বললে, সংসারে তার আপনার কেউ নেই বলে তার ভয়ও নেই, ভাবনাও নেই।

মনে মনে বললুম, তাই হবে। জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার বন্ধুর নাম কি গোঁসাই?

নাম শুনে যেন চমকে গেলুম। জানো ত গোঁসাই, ও নামটা আমার করতে নেই।

হাসিয়া বলিলাম, জানি। তোমার মুখেই শুনেছি।

বৈষ্ণবী কহিল, জিজ্ঞেস করলুম, বন্ধু দেখতে কেমন? বয়স কত? গোঁসাই কত কি যে বলে গেল, তার কতক বা আমার কানে গেল, কতক বা গেল না, কিন্তু বুকের ভেতরটায় ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। তুমি ভাববে, এমন মানুষ ত দেখি নি—এরা নাম শুনেই যে পাগল হয়। কিন্তু শুধু নাম শুনেই মেয়েমানুষ পাগল হয় গোঁসাই—এ সত্যি?

বলিলাম, তারপর?

বৈষ্ণবী বলিল; তারপরে নিজেও হাসতে লাগলুম, কিন্তু ভুলতে আর পারলুম না। সব কাজকর্মেই কেবল একটা কথা মনে হয়, তুমি আবার কবে আসবে। তোমাকে নিজের চোখে দেখতে পাবো কবে।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু তাহার মুখের পানে চাহিয়া আর হাসিতে পারিলাম না।

বৈষ্ণবী বলিল, সবে কাল সন্ধ্যায় ত তুমি এসেছো, কিন্তু আজ আমার চেয়ে বেশি এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালবাসে না। পূর্বজন্ম সত্যি না হলে এমন অসম্ভব কাণ্ড কি কখনো একটা দিনের মধ্যে ঘটতে পারে?

একটু থামিয়া আবার সে বলিল, আমি জানি তুমি থাকতেও আসো নি, থাকবেও না। যত প্রার্থনাই জানাই নে কেন, দু-একদিন পরেই চলে যাবে; কিন্তু আমি যে কতদিনে এই ব্যথা সামলাবো তাই কেবল ভাবি।—এই বলিয়া সে সহসা অঞ্চলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

চুপ করিয়া রহিলাম। এত অল্পকালে এমন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় রমণীর প্রণয়-নিবেদনের কাহিনী ইহার পূর্বে কখনো পুস্তকেও পড়ি নাই, লোকের মুখেও শুনি নাই এবং ইহা অভিনয় যে নয়, তাহা নিজের চোখেই দেখিতেছি। কমললতা দেখিতে ভালো অক্ষর-পরিচয়হীন মূর্খও নয়, তাহার কথাবার্তায়, তাহার গানে, তাহার যত্ন ও অতিথি-সেবার আন্তরিকতায় তাহাকে আমার ভালো লাগিয়াছে এবং সেই ভালো লাগাটা প্রশস্তি ও রসিকতার অত্যুক্তিতে ফলাও করিয়া তুলিতে নিজেও কৃপণতা করি নাই, কিন্তু দেখিতে দেখিতে পরিণতি যে এমন ঘোরালো হইয়া উঠিবে, বৈষ্ণবীর আবেদনে, অশ্রু-মোচনে ও মাধুর্যের অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশে সমস্ত মন যে এমন তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে, ক্ষণকাল পূর্বেও তাহা কি জানিতাম! যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কেবল লজ্জাতেই যে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল তাই নয়, কি-একপ্রকার অজানা বিপদের আশঙ্কায় অন্তরের কোথাও আর শান্তি-স্বস্তি রহিল না। জানি না, কোন অশুভলগ্নে কাশী হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, এ যে এক পুঁটুর জাল কাটিয়া আর এক পুঁটুর ফাঁদে গিয়া ঘাড়মোড় গুঁজিয়া পড়িলাম। এদিকে বয়স ত যৌবনের সীমানা ডিঙাইতেছে, এই সময়ে অযাচিত নারীপ্রেমের বন্যা নামিল নাকি, কোথায় পলাইয়া যে আত্মরক্ষা করিব ভাবিয়া পাইলাম না। যুবতী-রমণীর প্রণয়ভিক্ষাও যে পুরুষের কাছে এত অরুচিকর হইতে পারে তাহার ধারণাও ছিল না। ভাবিলাম, অকস্মাৎ মূল্য আমার এত বাড়িল কি করিয়া? আজ রাজলক্ষ্মীর প্রয়োজনও আমাতে শেষ হইতে চাহে না—বজ্রমুষ্টি এতটুকু শিথিল করিয়াও আমাকে সে নিষ্কৃতি দিবে না এ মীমাংসা চুকিয়াছে; কিন্তু এখানে আর না। সাধুসঙ্গ মাথায় থাক, স্থির করিলাম, কালই এ স্থান ত্যাগ করিব।

বৈষ্ণবী হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিল—এই যাঃ। তোমার জন্যে যে চা আনিয়েচি গোঁসাই।

বলো কি? পেলে কোথায়?

শহরে লোক পাঠিয়েছিলুম। যাই, তৈরি করে আনি গে। কোথাও পালিয়ো না যেন।

না; কিন্তু তৈরি করতে জানো ত?

বৈষ্ণবী জবাব দিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে সেই দিকে চাহিয়া মনের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা বাজিল। চা-পান আশ্রমের ব্যবস্থা নয়, হয়ত নিষেধই আছে, তবু ও-জিনিসটা যে আমি ভালোবাসি এ খবর সে জানিয়াছে এবং শহরে লোক পাঠাইয়া সংগ্রহ করিয়াছে। তাহার বিগত জীবনের ইতিহাস জানি না, বর্তমানেরও না, কেবল আভাসে এইটুকু শুনিয়াছি তাহা ভালো নয়, তাহা নিন্দার্হ, শুনিলে লোকের ঘৃণা জন্মে। তথাপি, আমার কাছে সে-কাহিনী সে লুকাইতে চাহে নাই, বলিবার জন্যই বার বার পীড়াপীড়ি করিয়াছে, তবু আমিই শুনতে রাজি হই নাই। আমার কৌতূহল নাই—কারণ, প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন তাহার। একলা বসিয়া সেই প্রয়োজনের কথাটা ভাবিতে গিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, আমাকে না বলিয়া তাহার অন্তরের গ্লানি ঘুচিতেছে না—মনের মধ্যে সে

কিছুতেই জোর পাইতেছে না।

শুনিয়াছি আমার শ্রীকান্ত নামটা কমললতার উচ্চারণ করিতে নাই। জান না কে তাহার এই পরমপূজ্য গুরুজন এবং কবে সে ইহলোক হইতে বিদায় হইয়াছে। দৈবাৎ আমাদের নামের মিলটাই বোধ করি এই বিপত্তির সৃষ্টি করিয়াছে এবং তখন হইতে কল্পনায় সে গত-জনমের স্বপ্ন-সাগরে ডুব মারিয়া সংসারের সকল বাস্তবতায় জলাঞ্জলি দিয়াছে।

তবু মনে হয় বিস্ময়ের কিছু নাই। রসের আরাধনায় আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়াও তাহার একান্ত নারী-প্রকৃতি আজও হয়ত রসের তত্ত্ব পায় নাই। সেই অসহায় অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তি এই নিরবচ্ছিন্ন ভাব-বিলাসের উপকরণ সংগ্রহে হয়ত আজ ক্লান্ত,—দ্বিধায় পীড়িত। সেই তার পথভ্রষ্ট বিভ্রান্ত মন আপন অজ্ঞাতসারে কোথায় যে অবলম্বন খুঁজিয়া মরিতেছে, বৈষ্ণবী তাহার ঠিকানা জানে না—আজ তাই সে চমকিয়া বারে বারে তাহার বিগত-জনমের রুদ্ধ দ্বারে হাত পাতিয়া অপরাধের সান্ত্বনা মাগিতেছে। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারি আমার 'শ্রীকান্ত' নামটাকেই পাথেয় করিয়া আজ সে খেয়া ভাসাইতে চায়।

বৈষ্ণবী চা আনিয়া দিল ; সবই নূতন ব্যবস্থা, পান করিয়া গভীর আনন্দ লাভ করিলাম। মানুষের মন কত সহজেই না পরিবর্তিত হয়,—আর যেন তাহার বিরুদ্ধে কোন নালিশ নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতা, তোমরা কি শুঁড়ী?

কমললতা হাসিয়া বলিল, না, সোনার-বেণে ; কিন্তু তোমাদের কাছে ত প্রভেদ নেই, ও দুই-ই এক।

কহিলাম, অন্ততঃ আমার কাছে তাই বটে। দুই-ই এক কেন, সবাই এক হলেও ক্ষতি ছিল না।

বৈষ্ণবী বলিল, তাইত মনে হয়। তুমি গহরের মায়ের হাতেও খেয়েছো?

বলিলাম, তাঁকে তুমি জানো না। গহর বাপের মত হয় নি, তার মায়ের স্বভাব পেয়েছে। এমন শান্ত, আত্মভোলা মিষ্টি মানুষ আর কখনো দেখেচো? ওর মা ছিলেন তেমনি। একবার ছেলেবেলায় গহরের বাপের সঙ্গে তাঁর ঝগড়ার কথা আমার মনে আছে। কাকে নাকি লুকিয়ে অনেকগুলো টাকা দেওয়া নিয়ে ঝগড়া বাধলো, গহরের বাপ ছিল বদরাগী লোক, আমরা ত ভয়ে গেলাম পালিয়ে। ঘণ্টাখানেক পরে চুপি চুপি ফিরে এসে দেখি গহরের মা চুপ করে বসে। গহরের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করতে প্রথমটা তিনি কথা কইলেন না, কিন্তু আমাদের মুখের পানে চেয়ে থেকে হঠাৎ একেবারে হেসে লুটিয়ে পড়লেন। চোখ দিয়া ফোঁটা কতক জল গড়িয়ে পড়লো। এ-অভ্যাস তাঁর ছিল।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, এতে হাসির কি হ'লো?

বলিলাম, আমরাও ত তাই ভাবলাম ; কিন্তু হাসি থাকলে কাপড়ে চোখ মুছে ফেলে

বললেন, আমি কি বোকা মেয়ে বাপু। ও দিব্যি নেয়ে-খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে, আর আমি না খেয়ে উপুস করে রেগে জ্বলে-পুড়ে মরচি। কি দরকার বলো ত! আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রাগ-অভিমান ধুয়ে-মুছে নির্মল হয়ে গেল। মেয়েদের এ যে কত বড় গুণ, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানে না।

বৈষ্ণবী প্রশ্ন করিল, তুমি কি ভুক্তভোগী নাকি গোঁসাই?

একটু বিব্রত হইলাম। প্রশ্নটা তাহাকে ছাড়িয়া যে আমার ঘাড়ে পড়িবে তাহা ভাবি নাই। বলিলাম সবই কি নিজে ভুগতে হয় কমললতা, পরের দেখেও শেখা যায়। ঐ ভুরুওয়ালা লোকটার কাছে তুমি কি কিছু শেখো নি?

বৈষ্ণবী বলিল, কিন্তু ও ত আমার পর নয়।

আর কোন প্রশ্ন আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না—একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী নিজেও কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তারপরে হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমাকে মিনতি করি গোঁসাই, আমার গোড়ার কথাটা একবার শোন—

বেশ, বলো!

কিন্তু বলিতে গিয়া দেখিল বলা সহজ নয়। আমারি মত নতমুখে তাহাকেও বহুক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিতে হইল; কিন্তু সে হার মানিল না, অন্তর্বিদ্রোহে জয়ী হইয়া এক সময়ে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন আমারও মনে হইল তাহার স্বভাবতঃ সুশ্রী মুখের 'পরে যেন বিশেষ একটি দীপ্তি পড়িয়াছে। বলিল, অহংকার যে মরেও মরে না গোঁসাই। আমাদের বড়গোঁসাই বলে, ও যেন তুষের আগুন, নিবেও নিবে না। ছাই সরালেই চোখে পড়ে ধিকিধিকি জ্বলছে; কিন্তু তাই বলে ফুঁ দিয়ে ত বাড়াতে পারব না। আমার এ পথে আসাই যে তাহলে মিথ্যে হয়ে যাবে। শোন; কিন্তু মেয়েমানুষ ত—হয়ত সব কথা খুলে বলতেও পারবো না।

আমার কুণ্ঠার অবধি রহিল না। শেষবারের মত মিনতি করিয়া বলিলাম, মেয়েদের পদস্খলনের বিবরণে আমার আগ্রহ নেই, ঔৎসুক্য নেই ও শুনতে আমার কোনদিন ভালো লাগে না, কমললতা! তোমাদের বৈষ্ণব-সাধনায় অহংকার বিনাশের কোন্ পন্থা মহাজনেরা নির্দেশ করে দিয়েছিলেন আমি জানি নে, কিন্তু নিজের গোপন পাপ অনাবৃত করার স্পর্দ্ধিত বিনয়ই যদি তোমাদের প্রায়শ্চিত্তের বিধান হয়, এ-সব কাহিনী যাদের কাছে অত্যন্ত রুচিকর এমন বহুলোকের সাক্ষাৎ তুমি পাবে কমললতা, আমাকে ক্ষমা কর। এ ছাড়া বোধ হয় কালই আমি চলে যাবো—জীবনে হয়ত আর কখনো আমাদের দেখা হবে না।

বৈষ্ণবী কহিল, তোমাকে ত আগেই বলেছি গোঁসাই, প্রয়োজন তোমার নয়, আমার, কিন্তু কালকের পরে আর আমাদের দেখা হবে না, এই কি তুমি সত্যিই বলতে চাও? না, কখনো তা নয়, আমার মন বলে, আবার দেখা হবে—আমি সেই আশা নিয়েই থাকবো; কিন্তু যথার্থ-ই কি আমার সম্বন্ধে তোমার কোন কথা জানতে ইচ্ছে করে না? চিরকাল শুধু একটা সন্দেহ আর অনুমান নিয়েই থাকবে?

প্রশ্ন করলাম, আজ বনের মধ্যে যে-লোকটার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, যাকে তুমি আশ্রমে ঢুকতে দাও না, যার দৌরাত্ম্যে তুমি পালাতে চাচ্চো, সে কি তোমার সত্যিই কেউ নয়? নিছক পর?

কিসের ভয়ে পালাচ্চি তুমি বুঝেছো গোঁসাই?

হাঁ, এই ত মনে হয়! কিন্তু কে ও?

কে ও? ও আমার ইহ-পরকালের নরক যন্ত্রণা। তাই ত অহরহ ঠাকুরকে কেঁদে বলি, প্রভু আমি তোমার দাসী—মানুষের ওপর থেকে এত বড় ঘৃণা আমার মন থেকে মুছে দাও—আমি আবার সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

তাহার চোখের দৃষ্টিতে যেন আত্মগ্লানি ফুটিয়া উঠিল, আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী কহিল, অথচ ওর চেয়ে আপন একদিন আমার কেউ ছিল না—জগতে অত ভাল বোধ করি কেউ কাউকে বাসে নি।

তাহার কথা শুনিয়া বিস্ময়ের সীমা রহিল না, এবং এই সুরূপা রমণীর তুলনায় সেই ভালবাসার পাত্রটির কুৎসিত কদাকার মূর্তি স্মরণ করিয়া মনও ভারি ছোট হইয়া গেল।

বুদ্ধিমতী বৈষ্ণবী আমার মুখের প্রতি চাহিয়া তাহা বুঝিল, কহিল, গোঁসাই, এত শুধু ওর বাইরেটা—ওর ভেতরের পরিচয়টা শোন।

বলো।

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল, আমার আরও দুটি ছোট ভাই আছে, কিন্তু বাপ-মায়ের আমি একমাত্র মেয়ে। বাড়ি আমাদের শ্রীহট্টে, কিন্তু বাবা কারবারি লোক, তাঁর ব্যবসা কলকাতায় বলে ছেলেবেলা থেকে আমি কলকাতায় মানুষ। মা সংসার নিয়ে দেশের বাড়িতেই থাকেন, আমি পুজোর সময় যদি কখনো দেশে যেতুম, মাসখানেকের বেশি থাকতে পারতুম না। আমার ভালও লাগত না। কলকাতাতেই আমার বিয়ে হয়, সতেরো বছর বয়সে কলকাতাতেই আমি তাঁকে হারাই তাঁর নামের জন্যেই গোঁসাই, তোমার নামটা গহর গোঁসাইয়ের মুখে শুনে আমি চমকে উঠি। এইজন্যই নতুনগোঁসাই বলে ডাকি, নামটা তোমার মুখে আনতে পারি নে।

বলিলাম, সে আমি বুঝেচি, তারপর?

বৈষ্ণবী কহিল, যার সঙ্গে তোমার আজ দেখা তার নাম মন্মথ, ও ছিল আমাদের সরকার।—এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, আমার বয়স যখন একুশ বছর তখন আমার সন্তানসম্ভাবনা হ'লো—

বৈষ্ণবী বলিতে লাগিল, মন্মথর একটি পিতৃহীন ভাইপো আমাদের বাসায় থাকতো, বাবা তাকে কলেজে পড়াতেন। বয়সে আমার চেয়ে সামান্য ছোট ছিল, আমাকে সে যে কত ভালবাসত তার সীমা ছিল না। তাকে ডেকে বললুম—যতীন, কখনো তোমার কাছে কিছু চায় নি ভাই, আমার এ বিপদে শেষবারের মতো আমাকে একটু সাহায্য করো, আমাকে এক টাকার বিষ কিনে এনে দাও।

কথাটা প্রথমে সে বুঝতে পারে নি, কিন্তু যখন বুঝলে, মুখখানা তার মড়ার মতো

ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললুম, দেরি করলে হবে না ভাই, তোমাকে এখুনি কিনে এনে দিতে হবে। এ ছাড়া আমার আর অন্য পথ নেই।

শুনে যতীনের সে কি কান্না! সে ভাবতো আমাকে দেবতা, ডাকতো আমাকে দিদি বলে। কি আঘাত কি ব্যথাই সে যে পেলে, তার চোখের জল আর শেষ হতেই চায় না। বললে উষাদিদি, আত্মহত্যার মতো মহাপাপ আর নেই। একটা অন্যায়ের কাঁধে আর একটা তার বড়ো অন্যায় চাপিয়ে দিয়ে তুমি পথ খুঁজে পেতে চাও? কিন্তু লজ্জা থেকে বাঁচবার এই উপায় যদি তুমি স্থির করে থাকো দিদি, আমি কখনো সাহায্য করব না। এ ছাড়া তুমি আর যা আদেশ করবে আমি স্বচ্ছন্দে পালন করব। তার জন্যেই আমার মরা হলো না। ক্রমশঃ কথাটা বাবার কানে গেল। তিনি যেমন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, তেমনি শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। আমাকে কিছুই বললেন না, কিন্তু দুঃখে, লজ্জায় দু-তিন দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলেন না। তারপরে গুরুদেবের পরামর্শে আমাকে নিয়ে নবদ্বীপে এলেন। কথা হলো, মন্মথ এবং আমি দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হবো; তখন ফুলের মালা আর তুলসীর মালা বদল ক'রে নতুন আচারে হবে আমাদের বিয়ে। তাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিনা জানি নে, কিন্তু যে শিশু গর্ভে এসেছে, মা হয়ে তাকে যে হত্যা করতে হবে না সেই ভরসাতেই যেন অর্ধেক বেদনা মুছে গেল। উদ্যোগ আয়োজন চললো, দীক্ষাই বলো আর ভেকই বলো, তাও আমাদের সাঙ্গ হলো. আমার নতুন নামকরণ হলো—কমললতা; কিন্তু তখনো জানিনে যে বাবা দশহাজার টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তবে মন্মথকে রাজি করিয়েছিলেন; কিন্তু হঠাৎ কি কারণে জানি নে বিয়ের দিনটা দিনকয়েক পিছিয়ে গেল। বোধ হয় সপ্তাহখানেক হবে। মন্মথকে বড় একটা দেখি নে, নবদ্বীপের বাসায় আমি একলাই থাকি। এমনই ক'দিন যায় তারপরে শুভদিন আবার এসে উপস্থিত হলো। স্নান করে, শুচি হয়ে শান্ত মনে ঠাকুরের প্রসাদী মালা হাতে প্রতীক্ষা করে রইলুম।

বাবা বিষণ্ণমুখে একবার ঘুরে গেলেন, কিন্তু নবীন বৈষ্ণবের বেশে মন্মথর যখন দেখা মিললো, হঠাৎ সমস্ত মনের ভেতরটায় যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল। সে আনন্দের কি ব্যথার, ঠিক জানি নে, হয়ত দুই-ই ছিল, কিন্তু ইচ্ছে হলো উঠে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আসি; কিন্তু লজ্জায় সে আর হয়ে উঠল না।

আমাদের কলকাতার পুরানো দাসী কি সব জিনিসপত্র নিয়ে এলো, সে আমাকে মানুষ করেছিল, তার কাছেই দিন পিছোবার কারণ শুনতে পেলুম।

কতকালের কথা, তবু গলা ভারী হইয়া তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। বৈষ্ণবী মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কারণটা কি বললে সে?

বৈষ্ণবী কহিল, বললে, মন্মথ হঠাৎ দশ হাজারের বদলে বিশ হাজার টাকা দাবি করে বসলো। আমি কিছুই জানতুম না, চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম, মন্মথ কি টাকার বদলে রাজি হয়েছে নাকি? আর বাবাও বিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছেন? দাসী বললে, উপায় কি দিদিমণি? ব্যাপারটা ত সহজ নয়, প্রকাশ হয়ে পড়লে যে

সমাজে জাত-কুল-মান সব যাবে। মন্মথ আসল কথাটা শেষকালে প্রকাশ করে দিলে, বললে, দায়ী ত সে নয়, দায়ী তার ভাইপো যতীন। সুতরাং বিনা দোষে যদি তাকে জাত দিতেই হয় ত বিশ হাজারের কমে পারবে না। তা ছাড়া পরের ছেলের পিতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া—এ কি কম কঠিন!

যতীন তার ঘরে বসে পড়ছিলো, তাকে ডেকে এনে কথাটা শোনানো হলো। শুনে প্রথমটা সে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপরে বললে, মিছে কথা।

পিতৃব্য মন্মথ গর্জন করে উঠলো—পাজি নচ্ছার নেমকহারাম! যে লোক তোকে ভাত-কাপড় দিয়ে কলেজে পড়িয়ে মানুষ করচে, তুই তারই করলি সর্বনাশ! কি কাল-সাপকেই না আমি মনিবের ঘরে ডেকে এনেছিলাম। ভেবেছিলাম বাপ-মা-মরা ছেলে, মানুষ হবে। ছি ছি! এই না বলে সে বুকে কপালে পটাপট করাঘাত করতে লাগল, বললে, একথা উষা নিজের মুখে ব্যক্ত করেছে আর তুই বলিস, না।

যতীন চমকে উঠে বললে, উষাদিদি নিজে বলেছেন আমার নামে? কিন্তু তিনি ত কখনো মিথ্যে বলেন না—এত বড় মিথ্যে অপবাদ তাঁর মুখ থেকে কিছুতেই বার হতে পারে না।

মন্মথ আর একবার তর্জন করে উঠলো—ফের। তবু অস্বীকার করবি পাজি হতভাগা শয়তান। জিজ্ঞেস কর্ তবে মনিবকে। তিনি কি বলেন শোন্।

কর্তা সায় দিয়ে বললেন, হাঁ।

যতীন বললে, দিদি নিজে করেছেন আমার নাম?

কর্তা আবার ঘাড় নেড়ে বললেন, হাঁ।

বাবাকে সে দেবতা বলে জানত, এর পর আর প্রতিবাদ করলে না, স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল। কি ভাবলে সেই জানে।

রাত্রে কেউ আর খোঁজ করলে না, সকালে কে এসে তার খবর দিলে, সবাই ছুটে গিয়ে দেখলে আমাদের ভাঙা আস্তাবলের এক কোণে যতীন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলচে।

বৈষ্ণবী কহিল, শাস্ত্রে ভাইপোর আত্মহত্যায় খুড়োর অশৌচের বিধি আছে কিনা জানি নে গোঁসাই, হয়ত নেই, হয়ত ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়—সে যাই হোক, শুভদিন দিন-কয়েক মাত্র পিছিয়ে গেল—তার পরে গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ শুচি হয়ে মন্মথগোঁসাই মালা-তিলক ধারণ করে অধীনার পাপ-বিমোচনের শুভ সংকল্প নিয়ে নবদ্বীপে এসে অবতীর্ণ হলেন।

একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বৈষ্ণবী পুনরায় কহিল, সেদিন ঠাকুরের প্রসাদী মালা ঠাকুরের পাদপদ্মে ফিরিয়ে দিয়ে এলুম। মন্মথর অশৌচ গেল, কিন্তু পাপিষ্ঠা উষার অশৌচ ইহজীবনে আর ঘুচল না নতুনগোঁসাই।

কহিলাম, তারপরে?

বৈষ্ণবী মুখ ফিরাইয়াছিল, জবাব দিল না। বুঝিলাম, এবার তাহার সামলাইতে সময় লাগিবে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিলাম।

ইহার শেষ অংশটুকু শুনিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রশ্ন করা উচিত কিনা

ভাবিতেছিলাম, বৈষ্ণবী আর্দ্র ও মৃদুকণ্ঠে নিজেই বলিল, দ্যাখো গোঁসাই পাপ জিনিসটা সংসারে এমন ভয়ংকর কেন জানো ?

বলিলাম, নিজের বিশ্বাস মতো জানি একরকম, কিন্তু তোমার ধারণার সঙ্গে সে হয়ত না মিলতে পারে।

সে প্রত্যুত্তরে কহিল, জানি নে তোমার বিশ্বাস কি, কিন্তু সেদিন থেকে আমি একে আমার মতো ক'রে বুঝে রেখেছি, গোঁসাই। স্পর্ধাভরে তুমি লোককে বলতে শুনবে -কিছুই হয় না। তারা কত লোকের নজির দিয়ে তাদের কথা প্রমাণ করতে চাইবে; কিন্তু তার ত কোন দরকার নেই। তার প্রমাণ মন্মথ, প্রমাণ আমি নিজে। আজও কিছু আমাদের হয় নি। হ'লে একে এতো ভয়ংকর আমি বলতুম না, কিন্তু তা ত নয়, এর দণ্ড ভোগ করে নিরাপরাধ নির্দোষী লোকেরা। যতীনের বড় ভয় ছিল আত্ম-হত্যায়, কিন্তু সে তাই দিয়ে তার দিদির অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল। বল ত গোঁসাই, এর চেয়ে ভয়ংকর নিষ্ঠুর সংসারে আর কি আছে? কিন্তু এমনই হয়, এমনি ক'রেই ঠাকুর বোধ হয় তাঁর সৃষ্টি রক্ষে করেন।

এ নিয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই। তাহার যুক্তি এবং ভাষা কোনটাই প্রাঞ্জল নয়, তথাপি ইহাই মনে করিলাম, তাহার দুষ্কৃতির শোকাচ্ছন্ন স্মৃতি হয়ত এই পথেই আপন পাপ-পুণ্যের উপলব্ধি অর্জন করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে।

জিজ্ঞাসা কবিলাম, কমললতা, এর পরে কি হলো ?

শুনিয়া সহসা সে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, সত্যি বলো গোঁসাই, এর পরেও আমার কথা তোমার শুনতে ইচ্ছে করে ?

সত্যিই বলচি, করে।

বৈষ্ণবী বলিল, আমার ভাগ্য যে এ জন্মে আবার তোমার দেখা পেলুম। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, দিন চারেক পরে একটা মরা ছেলে ভূমিষ্ঠ হলো, তাকে গঙ্গার তীরে বিসর্জন দিয়ে গঙ্গায় স্নান করে বাসায় ফিরে এলুম। বাবা কেঁদে বললেন, আমি ত আর থাকতে পারি নে মা। বললুম, না বাবা, তুমি আর থেকো না, তুমি বাড়ি যাও। অনেক দুঃখ দিলুম, আর তুমি আমার জন্যে ভেবো না।

বাবা বললেন, মাঝে মাঝে খবর দিবি ত মা ?

বললুম, না বাবা, আমার খবর নেবার আর তুমি চেষ্টা ক'রো না।

কিন্তু তোমার মা যে এখনো বেঁচে রয়েছে, ঊষা ?

বললুম, আমি মরবো না বাবা, কিন্তু আমার সতী লক্ষ্মী মা, তাঁকে বলো—ঊষা মরেছে। মা দুঃখ পাবেন, কিন্তু মেয়ে তাঁর বেঁচে আছে শুনলে তার চেয়েও বেশি দুঃখ পাবেন। চোখের জল মুছে বাবা কলকাতায় চলে গেলেন।

আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, কমললতা বলিতে লাগিল, হাতে টাকা ছিল,

বাড়িভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গী জুটে গেল—তারা যাচ্ছিলো শ্রীবৃন্দাবনে —আমিও সঙ্গ নিলুম।

বৈষ্ণবী একটু থামিয়া বলিল, তারপরে কত তীর্থে, কত পথে, কত গাছতলায়, কতদিন কেটে গেল—

বলিলাম, তা জানি, কিন্তু কত শত বাবাজীর কত শত সহস্র চোখের দৃষ্টির বিবরণ ত তুমি বললে না, কমললতা?

বৈষ্ণবী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, বাবাজীদের দৃষ্টি অতিশয় নির্মল, তাঁদের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার কথা বলতে নেই, গোঁসাই।

বলিলাম, না না, অশ্রদ্ধা নয়, অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাঁদের কাহিনী শুনতে চাইছি, কমললতা!

এবার সে হাসিল না বটে, কিন্তু চাপা-হাসি গোপন করিতেও পারিল না, কহিল, যে বাবাজী ভালবাসে তাকে সব কথা খুলে বলতে নেই, আমাদের বোষ্টমের শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

বলিলাম, তবে থাক। সব কথায় কাজ নাই, কিন্তু একটা বলো, গোঁসাইজী দ্বারিকদাসকে যোগাড় করলে কোথায়?

কমললতা সংকোচে জিভ কাটিয়া কপালে হাত ঠেকাইল, বলিল ঠাট্টা করতে নেই, উনি যে আমার গুরুদেব গোঁসাই।

গুরুদেব? তুমি ওঁর কাছেই দীক্ষা নিয়েছো?

না, দীক্ষা নিই নি বটে, কিন্তু উনি তাঁর মতোই পূজনীয়।

কিন্তু এই যে এতগুলো বৈষ্ণবী—সেবাদাসী না কি যে বলে—

কমললতা পুনশ্চ জিভ কাটিয়া বলিল, ওরা আমার মতোই ওঁর শিষ্যা। ওদেরও তিনি উদ্ধার করেছেন।

কহিলাম, নিশ্চয়ই করেছেন; কিন্তু পরকীয়া সাধনা না কি এমনি একটা সাধন-পদ্ধতি তোমাদের আছে—তাতে তো দোষ নেই—

বৈষ্ণবী আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, তোমরা দূরে থেকে আমাদের কেবল ঠাট্টা-তামাসাই করলে, কাছে এসে কখনো ত কিছু দেখলে না, তাই সহজেই বিদ্রূপ করতে পারো। আমাদের বড়গোঁসাইজী সন্ন্যাসী, ওঁকে উপহাস করলে অপরাধ হয়, নতুন গোঁসাই, অমন কথা আর কখনো মুখে এনো না।

তাহার কথা ও গাম্ভীর্যে একটু অপ্রতিভ হইলাম। বৈষ্ণবী তাহা লক্ষ্য করিয়া স্মিতমুখে বলিল, দুদিন থাকো না গোঁসাই আমাদের কাছে। কেবল বড়গোঁসাইজীর জন্যেই বলচি নে, আমাকে ত তুমি ভালবাসো, আর কখনো যদি দেখা না-ও হয় তবুও দেখে যাবে, কমললতা সত্যিই কি নিয়ে সংসারে থাকে। যতীনকে আমি আজো ভুলি নি—দুদিন থাকো—আমি বলচি তোমাকে দেখে যথার্থই খুশি হবে।

চুপ করিয়া রহিলাম। ইহাদের সম্বন্ধে একেবারেই যে কিছু জানি না তাহা নয়, জাত-বোষ্টমের মেয়ে টগরের কথাটাও মনে পড়িল, কিন্তু রহস্য করিতে আর প্রবৃত্তি হইল

না। যতীনের প্রায়শ্চিত্তের ঘটনা সকল আলোচনার মাঝখানে রহিয়া আমাকেও যেন উন্মনা করিয়া দিতেছিল।

বৈষ্ণবী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, হাঁ গোঁসাই, এই বয়সে সত্যিই কাউকে কখনো কি ভালোবাসো নি ?

তোমার কি মনে হয় কমললতা ?

আমার মনে হয়—না। তোমার মনটা হ'ল আসলে বৈরাগীর মন, উদাসীনের মন প্রজাপতির মতো। বাঁধন তুমি কখনো কোনোকালে নেবে না।

হাসিয়া বলিলাম, প্রজাপতির উপমা ত ভালো হ'ল না কমললতা, ওটা যে অনেকটা গালাগালির মত শুনতে। আমার ভালোবাসার মানুষ কোথাও যদি সত্যিই কেউ থাকে, তার কানে গেলে যে অনর্থ বাধাবে।

বৈষ্ণবীও হাসিল, কহিল, ভয় নেই গোঁসাই; সত্যিই যদি কেউ থাকে, আমার কথায় সে বিশ্বাস করবে না, তোমার মধু-মাখানো ফাঁকিও সে সারাজীবনে ধরতে পারবে না।

বলিলাম, তবে তার দুঃখ কিসের ? হোক না ফাঁকি কিন্তু তার কাছে ত সে-ই সত্যি হয়ে রইলো।

বৈষ্ণবী মাথা নাড়িয়া কহিল, সে হয় না গোঁসাই, মিথ্যে কখনো সত্যির জায়গা নিয়ে থাকতে পারে না। তারা বুঝতে না পারুক কারণটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট না হোক, তবু অন্তরটা তাদের নিরন্তর অশ্রুমুখী হয়েই থাকে। মিথ্যের কাণ্ড দেখেচি ত। এমনি ক'রে এ-পথে কত লোকই এলো, এ-পথ যাদের সত্যি নয়, জলের ধারা-পথে শুকনো বালির মতো সমস্ত সাধনাই তাদের চিরদিন আলগা হয়ে রইলো, কখনো জমাট বাঁধতে পারলে না।

একটু থামিয়া সে যেন হঠাৎ নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, তারা রসের খবর ত পায় না, তাই প্রাণহীন নির্জীব পুতুলের নিরর্থক সেবায় প্রাণ তাদের দুদিনে হাঁপিয়ে ওঠে, ভাবে এ কোন্ মোহের ঘোরে নিজেকে দিনরাত ঠকিয়ে মরি। এদের দেখেই আমাদের তোমরা উপহাস করতে শেখো—কিন্তু এ কি আমি বাজে বকে মরচি গোঁসাই, এবং অসংলগ্ন প্রলাপের তুমি ত একটা কথাও বুঝবে না; কিন্তু এমন যদি কেউ তোমার থাকে, তুমি তাকে ভুলবে কিন্তু সে তোমাকে না পারবে ভুলতে, না শুকোবে কখনো তার চোখের জলের ধারা।

স্বীকার করিলাম যে তাহার বক্তব্যের প্রথম অংশটা বুঝি নাই, কিন্তু শেষের দিকটার প্রতিবাদে কহিলাম, তুমি কি আমাকে এই কথাই বলতে চাও কমললতা, যে আমাকে ভালোবাসার নামই হলো দুঃখ পাওয়া ?

দুঃখ ত বলিনি গোঁসাই, বলছি চোখের জলের কথা।

কিন্তু ও দুই-ই এক কমললতা, শুধু কথার ঘোরফের।

বৈষ্ণবী কহিল, না গোঁসাই, ও দুটো এক নয়। না কথার ঘোরফের, না ভাবের

মেয়েরা ওর এটাও ভয় করে না, ওটাও এড়াতে চায় না ; কিন্তু তুমি বুঝবে কি করে ?

কিছুই যদি না বুঝি আমাকে বলাই বা কেন ?

না বলেও যে থাকতে পারি নে গো। প্রেমের বাস্তবতা নিয়ে তোমরা পুরুষের দল যখন বড়াই করতে থাকো, তখন ভাবি আমাদের জাত যে আলাদা। তোমাদের ও আমাদের ভালোবাসার প্রকৃতিই যে বিভিন্ন। তোমরা চাও বিস্তার, আমরা চাই গভীরতা ; তোমরা চাও উল্লাস, আমরা চাই শান্তি। জানো গোঁসাই, ভালোবাসার নেশাকে আমরা অন্তরে ভয় করি ; ওর মত্ততায় আমাদের বুকের কাঁপন থামে না।

কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু সে গ্রাহ্যই করিল না, ভাবের আবেগে বলিতে লাগিল, ও আমাদের সত্যিও নয়, আমাদের আপনও নয়। ওর ছুটোছুটির চঞ্চলতা যেদিন থামে, সেই দিনেই কেবল আমরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। ওগো নতুন-গোঁসাই, নির্ভর হতে পারার চেয়ে ভালোবাসার বড় পাওয়া মেয়েদের আর নেই, কিন্তু ঐ জিনিসটিই যে তোমার কাছে কেউ কখনো পাবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, পাবে না নিশ্চয় জানো ?

বৈষ্ণবী বলিল, নিশ্চয়ই জানি। তাই তোমার বড়াই আমার সয় না।

আশ্চর্য হইলাম। বলিলাম, বড়াই ত তোমার কাছে কখনো করি নি কমললতা ?

সে কহিল, জেনে করো নি, কিন্তু তোমার ঐ উদাসীন বৈরাগীর মন—ওর চেয়ে বড় অহংকারী জগতে আর কিছু আছে নাকি !

কিন্তু এই দুটো দিনের মধ্যে আমাকে এত তুমি জানলে কি ক'রে ?

জানলুম তোমাকে ভালোবেসেছি বলে।

শুনিয়া মনে মনে বলিলাম, তোমার দুঃখ আর চোখের জলের প্রভেদটা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, কমললতা। অবিশ্রাম ভাবের পুজো আর রসের আরাধনায় বোধ করি এমনি পরিণামই ঘটে।

প্রশ্ন করিলাম, ভালোবেসেছো একি সত্যি, কমললতা ?

হাঁ সত্যি।

কিন্তু তোমার জপতপ, তোমার কীর্তন, তোমার রাত্রিদিনের ঠাকুরসেবা এ সবের কি হবে বলো ত ?

বৈষ্ণবী কহিল, এরা আমার আরও সত্যি, আরও সার্থক হয়ে উঠবে। চলো না গোঁসাই, সব ফেলে দুজনে পথে পথে বেরিয়ে পড়ি ?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, সে হয় না কমললতা, কাল আমি চলে যাচ্ছি ; কিন্তু যাবার আগে গহরের কথাটা একটু জেনে যেতে ইচ্ছে করে।

বৈষ্ণবী নিঃশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিল, গহরের কথা ? না, সে শুনে তোমার কাজ নেই : কিন্তু সত্যিই কি কাল যাবে ?

হ্যাঁ, সত্যিই কাল যাবো।

বৈষ্ণবী মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, কিন্তু এ আশ্রমে আবার যখন তুমি আসবে তখন কিন্তু কমললতাকে আর খুঁজে পাবে না গোঁসাই।

॥ চার ॥

এখানে আর একদণ্ডও থাকা উচিত নয় এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না. কিন্তু তখনি কে যেন আড়ালে দাঁড়াইয়া চোখ টিপিয়া ইশারায় নিষেধ করে, বলে, যাবে কেন? ছ'সাত দিন থাকবে ব'লেই ত এসেছিলে—থাকো না। কষ্ট ত কিছুই নেই।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছিলাম, কে ইহারা একই দেহের মধ্যে বাস করিয়া একই সময়ে ঠিক উল্টো মতলব দেয়। কাহার কথা বেশি সত্য? কে বেশি আপনার? বিবেক, বুদ্ধি মন প্রবৃত্তি—এমন কত নাম, কত দার্শনিক ব্যাখ্যাই না ইহার আছে, কিন্তু নিঃসংশয় সত্যকে আজও কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল? যাহাকে ভালো বলিয়া মনে করি, ইচ্ছা আসিয়া সেখানে পা বাড়াইতে বাধা দেয় কেন? নিজের মধ্যে এই বিরোধ, এই দ্বন্দ্বের শেষ হয় না কেন? মন বলিতেছে, আমার চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ, চলিয়া যাওয়াই কল্যাণের. তবে পরক্ষণে সেই মনের দু'চোখ ভরিয়া জল দেখা দেয় কিসের জন্য? বুদ্ধি, বিবেক, প্রবৃত্তি, মন—এই সব কথার সৃষ্টি করিয়া কোথায় সত্যকার সান্ত্বনা?

তথাপি যাইতেই হইবে, পিছাইলে চলিবে না। এবং কালই। এই যাওয়াটা যে কি করিয়া সম্পন্ন করিব তাহাই ভাবিতেছিলাম। ছেলেবেলার একটা পথ জানি, সে অন্তর্হিত হওয়া। বিদায়-বাণী নয়, ফিরিয়া আসিবার স্তোকবাক্য নয়. কারণ প্রদর্শন নয়, প্রয়োজনের কর্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ নয়—শুধু আমি যে ছিলাম এবং আমি যে নাই, এই সত্য ঘটনাটা আবিষ্কারের ভার—যাহাদের রহিল তাহাদের 'পরে নিঃশব্দে অর্পন করা।

স্থির করিলাম, ঘুমানো হইবে না, ঠাকুরের মঙ্গল আরতি শুরু হইবার পূর্বেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া প্রস্থান করিব। একটা মুস্কিল, পটুর পণের টাকাটা ছোট ব্যাগ সমেত কমললতার কাছে আছে, কিন্তু সে থাক্। হয় কলিকাতা, নয় বর্মা হইতে চিঠি লিখিব, তাহাতে আরও একটা কাজ এই হইবে যে, আমাকে প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত কমললতাকে বাধ্য হইয়া এখানেই থাকিতে হইবে, পথে-বিপথে বাহির হইবার সুযোগ পাইবে না। এদিকে যে-কয়টা টাকা আমার জামার পকেটে পড়িয়া আছে কলিকাতায় পৌঁছিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত এমনি করিয়াই কাটিল, এবং ঘুমাইব না বলিয়া বার বার সংকল্প করিলাম বলিয়াই বোধ করি কোন্ এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, কিন্তু হঠাৎ মনে হইল বুঝি স্বপ্নে গান শুনিতেছি। একবার ভাবিলাম, রাত্রের ব্যাপার হয়ত এখনো সমাপ্ত হয় নাই, আবার মনে হইল প্রত্যূষের

মঙ্গল-আরতি বুঝি শুরু হইয়াছে, কিন্তু কাঁসরঘণ্টার সুপরিচিত দুঃসহ নিনাদ নাই। অসম্পূর্ণ অপরিতৃপ্ত নিদ্রা ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গে না, চোখ মেলিয়া চাহিতেও পারি না, কিন্তু কানে গেল ভোরের সুরে মধুর-কণ্ঠের আদরের অনুচ্চ আহ্বান—'রাই জাগো, রাই জাগো, শুকশারী বলে, কত নিদ্রা যাওলো কালো-মাণিকের কোলে'। গোঁসাইজী আর কত ঘুমাবে গো—ওঠো ?

বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। মশারি তোলা, পূবের জানালা খোলা—সম্মুখে আম্রশাখায় পুষ্পিত লবঙ্গ-মঞ্জরীর কয়েকটা সুদীর্ঘ স্তবক নীচে পর্যন্ত ঝুলিয়া আছে, তাহারি ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল আকাশের কতকটা জায়গায় ফিকে-রঙের আভাস দিয়াছে—অন্ধকার রাতে সুদূরে গ্রামান্তে আগুন লাগার মতো—মনের কোথায় যেন একটুখানি ব্যথিত হইয়া উঠে। গোটাকয়েক বাদুড় বোধ করি উড়িয়া বাসায় ফিরিতেছিল, তাহাদের পক্ষ তাড়নার অস্ফুট শব্দ পরে পরে কানে আসিয়া পৌঁছিল, বুঝা গেল আর যাই হোক, রাত্রিটা শেষ হইতেছে। এটা দোয়েল, বুলবুল ও, শ্যামাপাখির দেশ। হয়ত বা উহাদের রাজধানী—কলিকাতা শহর। আর ঐ বিরাট বকুলগাছটা তাহাদের লেন-দেন কাজকারবারের বড়বাজার—দিনের বেলায় ভীড় দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। নানা চেহারা, নানা ভাষা, নানা রং-বেরঙের পোশাক-পরিচ্ছদের অতি বিচিত্র সমাবেশ। আর রাত্রে আখড়ার চতুর্দিকে বনে-জঙ্গলে, ডালে ডালে তাহাদের অগুণতি আড্ডা। ঘুম ভাঙ্গার সাড়াশব্দ কিছু কিছু পাওয়া গেল—ভাবে বোধ হইল চোখে-মুখে জল দিয়া তৈরি হইয়া লইতেছে, এইবার সমস্ত দিনব্যাপী নাচ-গানের মোচ্ছব শুরু হইবে। সবাই এরা লক্ষ্ণৌয়ের ওস্তাদ—ক্লান্তও হয় না, কসরৎও থামায় না। ভিতরে বৈষ্ণবদলের কীর্তনের পালা যদিবা কদাচিৎ বন্ধ হয়, বাহিরে সে, বালাই নাই। এখানে ছোট-বড় ভাল-মন্দ বাছবিচার চলে না, ইচ্ছা এবং সময় থাক না থাক, গান তোমাকে শুনিতেই হইবে। এদেশের বোধ করি এইরূপই ব্যবস্থা। মনে পড়িল, কাল সমস্ত দুপুর পিছনের বাঁশবনে গোটা-দুই হরগৌরী পাখীর চড়া গলায় পিয়া-পিয়া-পিয়া ডাকের অবিশ্রান্ত প্রতিযোগিতায় আমার দিবানিদ্রার যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ আমারি ন্যায় বিক্ষুব্ধ কোন একটা ডাহুক নদীর কলমীদলের উপরে বসিয়া ততোধিক কঠিন কণ্ঠে ইহাদের বার বার তিরস্কার করিয়াও স্তব্ধ করিতে পারে নাই। ভাগ্য ভাল যে এদেশে ময়ূর মিলে না, নইলে উৎসবের গানের আসরে তাহারা আসিয়া যোগ দিলে আর মানুষ টিকিতে পারিত না। সে যাই হোক, দিনের উৎপাত এখনো আরম্ভ হয় নাই, হয়ত আর একটু নির্বিঘ্নে ঘুমাইতে পারিতাম, কিন্তু স্মরণ হইল গতরাত্রির সংকল্পের কথা ; কিন্তু গা-ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়িবারও যো নেই—প্রহরীর সতর্কতায় মতলব ফাঁসিয়া গেল ; রাগ করিয়া বলিলাম, আমি রাইও নই, আমার বিছানায় শ্যামও নেই—দুপুর রাতে ঘুম ভাঙ্গানোর কি দরকার ছিল বলো ত ?

বৈষ্ণবী কহিল, রাত কোথায় গোঁসাই, তোমার যে আজ ভোরের গাড়িতে কলকাতা যাবার কথা। মুখ হাত ধুয়ে এসো, আমি চা তৈরি করে আনি গে ;

কিন্তু স্নান ক'রো না যেন। অভ্যাস নেই, অসুখ করতে পারে।

বলিলাম, তা পারে। সকালের গাড়িতে যখন হোক আমি যাবো, কিন্তু তোমার এত উৎসাহ কেন বলো তো?

সে কহিল, আর কেহ ওঠার আগে আমি যে তোমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে চাই গোঁসাই। স্পষ্ট করিয়া তাঁহার মুখ দেখা গেল না, কিন্তু ছড়ানো চুলের পানে চাহিয়া ঘরের এই অত্যল্প আলোকেও বুঝা গেল সেগুলি ভিজা—স্নান সারিয়া বৈষ্ণবী প্রস্তুত হইয়া লইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে পৌঁছে দিয়ে আশ্রমেই আবার ফিরে আসবে ত?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ।

সেই ছোট টাকার থলিটি সে বিছানায় রাখিয়া দিয়া কহিল, এই তোমার ব্যাগ। এটা পথে সাবধানে রেখো—টাকাগুলো একবার দেখে নাও।

হঠাৎ মুখে কথা যোগাইল না, তারপরে বলিলাম, কমললতা, তোমার মিছে এ পথে আসা? একদিন নাম ছিল তোমার ঊষা, আজো সেই ঊষাই আছো—একটুও বদলাতে পারো নি!

কেন বলো ত?

তুমি বলো ত কেন বললে আমাকে টাকা গুণে নিতে? গুণে নিতে পারি বলে কি সত্যি মনে করো? যারা ভাবে একরকম, বলে অন্যরকম, তাদের বলে ভণ্ড। যাবার আগে বড়গোঁসাইজীকে আমি নালিশ জানিয়ে যাবো আখড়ার খাতা থেকে তোমার নামটা যেন তিনি কেটে দেন। তুমি বোষ্টমদলের কলঙ্ক!

সে চুপ করিয়া রহিল। আমিও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলাম, আজ সকালে আমার যাবার ইচ্ছে নেই।

নেই? তাহলে আর একটু ঘুমোও। উঠলে আমাকে খবর দিও—কেমন?

কিন্তু, এখন তুমি করবে কি?

আমার কাজ আছে। ফুল তুলতে যাবো।

এই অন্ধকারে? ভয় করবে না?

না, ভয় কিসের? ভোরের পুজোর ফুল আমিই তুলে আনি। নইলে ওদের বড় কষ্ট হয়।

ওদের মানে অন্যান্য বৈষ্ণবীদের। এই দুটো দিন এখানে থাকিয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম যে সকলের আড়ালে থাকিয়া মঠের সমস্ত গুরুভারই কমললতা একাকী বহন করে। তাহার কর্তৃত্ব সকল ব্যবস্থায়, সকলের 'পরেই; কিন্তু স্নেহে, সৌজন্যে ও সর্বোপরি সবিনয় কর্মকুশলতায় এই কর্তৃত্ব এমন সহজ শৃঙ্খলায় প্রবহমান যে কোথাও ঈর্ষা, ও বিদ্বেষের এতটুকু আবর্জনাও জমিতে পায় না। এই আশ্রমলক্ষ্মীটি আজ উৎকণ্ঠা-ব্যাকুলতায় যাই যাই করিতেছে। এ যে কত বড় দুর্ঘটনা, কত বড় নিরুপায় দুর্গতিতে এতগুলি নিশ্চিত নরনারী স্খলিত হইয়া পড়িবে তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি

করিয়া আমারও ক্লেশবোধ হইল। এই মঠে মাত্র দুটি দিন আছি, কিন্তু কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছি—ইহার আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষা না করিয়াই যেন পারি না এমনি মনোভাব। ভাবিলাম লোকে মিছাই বলে সকলে মিলিয়া আশ্রম—এখানে সবাই সমান; কিন্তু একের অভাবে যে কেন্দ্রভ্রষ্ট উপগ্রহের মতো সমস্ত আয়তনই দিগ্বিদিকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে, তাহা চোখের উপরেই যেন দেখিতে লাগিলাম। বলিলাম, আর শোবো না কমললতা, চলো তোমার সঙ্গে গিয়ে ফুল তুলে আনি গে।

বৈষ্ণবী কহিল, তুমি স্নান করো নি, কাপড় ছাড়ো নি, তোমার ছোঁয়া ফুলে পুজো হবে কেন?

বলিলাম, ফুল তুলতে না দাও, ডাল নুইয়ে ধরতে দেবে ত? তাতেও তোমার সাহায্য হবে।

বৈষ্ণবী বলিল, ডাল নোয়াবার দরকার হয় না, ছোট ছোট গাছ, আমি নিজেই পারি।

বলিলাম, অন্ততঃ সঙ্গে থেকে দুটো সুখদুঃখের গল্প করতে পারবো ত? তাতেও তোমার শ্রম লঘু হবে।

এবার বৈষ্ণবী হাসিল, হঠাৎ বড় দরদ যে গোঁসাই—আচ্ছা চলো, আমি সাজিটা আনি গে, তুমি ততক্ষণ হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নাও।

আশ্রমের বাহিরে অল্প একটু দূরে ফুলের বাগান। ঘন ছায়াচ্ছন্ন আমবনের ভিতর দিয়া পথ। শুধু অন্ধকারের জন্য নয়, রাশিকৃত শুকনো পাতায় পথের রেখা বিলুপ্ত। বৈষ্ণবী আগে, আমি পেছনে, তবু ভয় করিতে লাগিল পাছে সাপের ঘাড়ে পা দিই। বলিলাম, কমললতা, পথ ভুলবে না ত?

বৈষ্ণবী বলিল, না। অন্ততঃ তোমার জন্যেও আজ পথ চিনে আমাকে চলতে হবে।

কমললতা, একটা অনুরোধ রাখবে?

কি অনুরোধ?

এখান থেকে তুমি আর কোথাও চলে যেয়ো না!

গেলে তোমার লোকসান কি?

জবাব দিতে পারিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী বলিল মুরারি ঠাকুরের একটি গান আছে—'সখি হে, ফিরিয়া আপনা ঘরে যাও; জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে—তারে তুমি কি আর বুঝাও।' গোঁসাই বিকালে তুমি কলকাতায় চলে যাবে, আজ একটা বেলার বেশি বোধকরি এখানে আর থাকতে পারবে না—না?

বলিলাম, কি জানি, আগে সকালবেলাটা ত কাটুক।

বৈষ্ণবী জবাব দিল না, একটু পরে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল

'কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনী সুখ-দুখ দুটি ভাই—
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তারই ঠাঁই।'

থামিলে বলিলাম, তারপরে?

তারপরে আর জানি নে!

বলিলাম, তবে আর একটা কিছু গাও!

বৈষ্ণবী তেমনি মৃদুকণ্ঠে গাহিল—

"চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী পীরিতি না কহে কথা,
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলায় তথা।"

এবারেও থামিলে বলিলাম, তারপরে?

বৈষ্ণবী কহিল, তারপরে আর নেই, এখানেই শেষ।

শেষই বটে। দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। ভারি ইচ্ছা করিতে লাগিল, দ্রুত-পদে পাশে গিয়া কিছু একটা বলিয়া এই অন্ধকার পথটা তাহার হাত ধরিয়া চলি। জানি সে রাগ করিবে না, বাধা দিবে না, কিন্তু কিছুতেই পা-ও চলিল না, মুখেও একটা কথা আসিল না, যেমন চলিতেছিলাম তেমনি ধীরে ধীরে নীরবে বনের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

পথের ধারে বেড়া দিয়া ঘেরা আশ্রমের ফুলের বাগান, ঠাকুরের নিত্যপূজার জোগান দেয়। খোলা জায়গায় অন্ধকার আর নাই, কিন্তু ফর্সাও তেমন হয় নাই। তথাপি দেখা গেল অজস্র ফুটন্ত মল্লিকায় সমস্ত বাগানটা যেন সাদা হইয়া আছে। সামনের পাতা-ঝরা ন্যাড়া চাঁপাগাছটায় ফুল নাই কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বোধ করি অসময়ে প্রস্ফুটিত গোটাকয়েক রজনীগন্ধার মধুর গন্ধে সে ত্রুটি পূর্ণ হইয়াছে। আর সবচেয়ে মানাইয়াছে মাঝখানটায়। নিশান্তের এই ঝাপ্সা আলোতেও চেনা যায় শাখায়-পাতায় জড়াজড়ি করিয়া গোটা পাঁচ-ছয় স্থলপদ্মের গাছ—ফুলের সংখ্যা নাই—বিকশিত সহস্র আরক্ত আঁখি মেলিয়া বাগানের সকল দিকে তাহারা চাহিয়া আছে।

কখনো এত প্রত্যুষে শয্যা ছাড়িয়া উঠি না, এমন সময়টা চিরদিন নিদ্রাচ্ছন্ন জড়তায় অচেতনে কাটিয়া যায়—আজ কি যে ভালো লাগিল তাহা বলিতে পারি না। পূর্বে রক্তিম দিগন্তে জ্যোতির্ময়ের আভাস পাইতেছি, নিঃশব্দ মহিমায় সকল আকাশ শান্ত হইয়া আছে, আর ঐ লতায়-পাতায় শোভায়-সৌরভে ফুলে-ফুলে পরিব্যাপ্ত সম্মুখের উপবন—সমস্ত মিলিয়া এ-যেন নিঃশেষিত রাত্রির বাক্যহীন বিদায়ের অশ্রুরুদ্ধ ভাষা। করুণায়, মমতায় ও অযাচিত দাক্ষিণ্যে সমস্ত অন্তরটা আমার চক্ষুর নিমিষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—সহসা বলিয়া ফেলিলাম,—কমললতা, তুমি অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা পেয়েছো, প্রার্থনা করি এবার যেন সুখী হও।

বৈষ্ণবী সাজিটা চাঁপা-ডালে ঝুলাইয়া আগলের বাঁধন খুলিতেছিল, আশ্চর্য হইয়া ফিরিয়া চাহিল—হঠাৎ তোমার হলো কি গোঁসাই?

নিজের কথাটা নিজের কানেও কেমন খাপছাড়া ঠেকিয়াছিল, তাহার সবিস্ময় প্রশ্নে

মনে মনে ভারি অপ্রতিভ হইয়া গেলাম। মুখে উত্তর যোগাইল না, লজ্জিতের আবরণ একটা অর্থহীন হাসির চেষ্টায়ও ঠিক সফল হইল না, শেষে চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী ভিতরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে আমিও গেলাম। ফুল তুলিতে আরম্ভ করিয়া সে নিজেই কহিল, আমি সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদপদ্মে আপনাকে নিবেদন করে দিয়েছি, কখনো দাসীকে তিনি পরিত্যাগ করবেন না।

সন্দেহ হইল কথার অর্থটা বেশ পরিষ্কার নয়, কিন্তু সুস্পষ্ট করিতে বলারও ভরসা হইল না। সে মৃদু গুঞ্জনে গাহিতে লাগিল—"কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে, কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে। কানু অনুরাগে রাঙা বসন পরিয়া, দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া। যদুনাথ দাস কহে—"

থামাইতে হইল। বলিলাম, যদুনাথ দাস থাক, ওদিকে কাঁসরের বাদ্যি শুনতে পাচ্ছো কি? ফিরবে না?

সে আমার দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে পুনরায় আরম্ভ করিল, "ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই, মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই—" আচ্ছা নতুনগোঁসাই, জানো মেয়েদের মুখে গান অনেক ভালো লোকে শুনতে চায় না, তাদের ভারি খারাপ লাগে।

বলিলাম, জানি; কিন্তু আমি অতটা ভালো বর্বর নই।

তবে বাধা দিয়ে আমাকে থামালে কেন?

ওদিকে হয়ত আরতি শুরু হয়েছে—তুমি না থাকলে যে তার অঙ্গহানি হবে।

এটি মিথ্যে ছলনা গোঁসাই।

ছলনা হবে কেন?

কেন তা তুমিই জানো; কিন্তু এ কথা তোমাকে বলল কে?

আমার অভাবে ঠাকুরের সেবায় সত্যিই অঙ্গহানি হতে পারে, এ কি তুমি বিশ্বাস করো?

করি। আমাকে কেউ বলে নি কমললতা—আমি নিজের চোখে দেখেচি।

সে আর কিছু বলিল না, কি একরকম অন্যমনস্কের মতো ক্ষণকাল আমার মুখের প্যানে চাহিয়া রহিল, তারপরে ফুল তুলিতে লাগিল। ডালা ভরিয়া উঠিলে কহিল, হয়েচে—আর না।

স্থলপদ্ম তুললে না?

না, ও আমরা তুলি নে, ঐখানে থেকে ঠাকুরকে নিবেদন করে দিই। চলো এবার যাই।

আলো ফুটিয়াছে, কিন্তু গ্রামের একান্তে এই মঠ—এদিকে বড় কেহ আসে না। তখনো পথ ছিল জনহীন, এখনো তেমনি। চলিতে চলিতে একসময়ে আবার সেই প্রশ্নই করিলাম, তুমি কি এখান থেকে সত্যিই চলে যাবে?

বার বার এ কথা জেনে তোমার কি হবে গোঁসাই?

এবারেও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম,

সত্যই কেন বার বার এ কথা জানিতে চাই—জানিয়া আমার লাভ কি!

মঠে ফিরিয়া দেখা গেল ইতিমধ্যে সবাই জাগিয়া উঠিয়া প্রাত্যহিক কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। তখন কাঁসরের শব্দে ব্যস্ত হইয়া বৈষ্ণবীকে বৃথা তাড়া দিয়াছিলাম। অবগত হইলাম তাহা মঙ্গল-আরতির নয়, সে শুধু ঠাকুরদের ঘুম-ভাঙানোর বাদ্য। এ তাঁদেরই সয়।

দুজনকে অনেকেই চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাহারও চাহনিতে কৌতূহল নাই। শুধু পদ্মার বয়স অত্যন্ত কম বলিয়া সে-ই কেবল একটুখানি হাসিয়া মুখ নীচু করিল। ঠাকুরদের সে মালা গাঁথে। ডালাটা তাহারি কাছে রাখিয়া দিয়া কমললতা সস্নেহ-কৌতুকে তর্জন করিয়া বলিল, হাস্‌লি যে পোড়ারমুখী?

সে কিন্তু আর মুখ তুলিল না। কমললতা ঠাকুরঘরে গিয়া প্রবেশ করিল, আমিও আমার ঘরে গিয়া ঢুকিলাম।

স্নানাহার যথারীতি এবং যথাসময়ে সম্পন্ন হইল। বিকালের গাড়িতে আমার যাইবার কথা। বৈষ্ণবীর সন্ধান করিতে গিয়া দেখি সে ঠাকুরঘরে। ঠাকুর সাজাইতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র কহিল, নতুনগোঁসাই, যদি এলে আমাকে একটু সাহায্য করো না ভাই। পদ্মা মাথা ধরে শুয়ে আছে, লক্ষ্মী-সরস্বতী দু'বোনেই হঠাৎ জ্বরে পড়েচে—কি যে হবে জানি নে। এই বাসন্তী-রঙের কাপড় দুখানি কুঁচিয়ে দাওনা গোঁসাই।

অতএব, ঠাকুরের কাপড় কুঁচাইতে বসিয়া গেলাম, যাওয়া ঘটিল না। পরের দিনও না এবং তার পরের দিনও না। বৈষ্ণবীর প্রত্যূষের ফুল তুলিবার সঙ্গী আমি। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে একটা-না-একটা কিছু কাজ আমাকে দিয়া সে করাইয়া লয়। এমনি করিয়া দিনগুলো যেন স্বপ্নে কাটে। সেবায়, সহৃদয়তায়, আনন্দে, আরাধনায়, ফুলে, গন্ধে, কীর্তনে, পাখিদের গানে কোথাও আর ফাঁক নাই। অথচ সন্দিগ্ধ মন মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া ভর্ৎসনা করিয়া উঠে এ কি ছেলেখেলা? বাহিরের সকল সংস্রব রুদ্ধ করিয়া গুটিকয়েক নির্জীব পুতুল লইয়া এ কি মাতামাতি? এত বড় আত্ম-প্রবঞ্চনায় মানুষ বাঁচে কি করিয়া? কিন্তু তবু ভালো লাগে, যাই যাই করিয়াও পা বাড়াইতে পারি না। এদিকটায় ম্যালেরিয়া কম, তথাপি অনেকেই এই সময়টায় জ্বরে পড়িতেছিল। গহর একটি দিন মাত্র আসিয়াছিল, আর আসে নাই তাহারও খোঁজ লইবার সময় করিয়া উঠিতে পারি না—এ আমার হইয়াছে ভালো।

সহসা মনের ভিতরটা ভয় ও ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া উঠিল—এ আমি করিতেছি কি? সঙ্গদোষে এই সবই কি সত্য বলিয়া একদিন বিশ্বাসে দাঁড়াইবে নাকি? স্থির করিলাম, আর না—যা-ই কেন না ঘটুক, এ জায়গা ছাড়িয়া কাল আমাকে পলাইতেই হইবে।

প্রত্যহ রাত্রিশেষে বৈষ্ণবী আসিয়া আমাকে জাগায়। ভোরের সুরে বৈষ্ণব-কবিদের ঘুম ভাঙানোর গান। ভক্তি ও ভালবাসার সে কি সকরুণ আবেদন! হঠাৎ সাড়া

দিই না, কান পাতিয়া শুনি। চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িতে চায়। মশারি তুলিয়া সে দোর জানালা খুলিয়া দেয়—রাগ করিয়া উঠিয়া বসি, এবং মুখ-হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া সঙ্গে চলি।

দিনকয়েকের অভ্যাসে আপনি আজ ঘুম ভাঙিল। ঘর অন্ধকার। একবার মনে হইল রাত্রি এখনো পোহায় নাই, কিন্তু সন্দেহ জন্মিল। বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম—দেখি রাত কোথায়, সকাল হইয়াছে। কে একজন খবর দিতে কমললতা আসিয়া দাঁড়াইল; এমন অস্নাত, অপ্রস্তুত চেহারা তাহার পূর্বে দেখি নাই।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমারও অসুখ নাকি?

সে ম্লান হাসিয়া কহিল, আজ তুমি জিতেছো গোঁসাই।

কিসে, বলো ত?

শরীরটা আজ তেমন ভালো নেই, সময়ে উঠতে পারি নি।

আজ তবে ফুল তুলতে গেল কে?

উঠানের ধারে আধমরা একটা টগর গাছে সামান্য কয়েকটা ফুল ছিল তাহাই দেখাইয়া কহিল, এ বেলা যা ক'রে হোক ওতেই চলে যাবে।

কিন্তু ঠাকুরের গলার মালা?

মালা আজ তাঁদের পরাতে পারবো না।

শুনিয়া মন কেমন করিয়া উঠিল—সেই নির্জীব পুতুলগুলোর জন্যেই. বলিলাম, স্নান করে তবে আমি তুলে এনে দিই?

তা যাও, কিন্তু এত ভোরে নাইতে পাবে না। অসুখ করবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বড়গোঁসাইজীকে দেখচি নে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, তিনি ত এখানে নেই, পরশু নবদ্বীপে গেছেন তাঁর গুরুদেবকে দেখতে।

কবে ফিরবেন?

সে ত জানি নে গোঁসাই!

এতদিন মঠে থাকিয়াও বৈরাগী দ্বারিকাদাসের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। কতকটা আমার নিজের দোষে, কতকটা তাঁহার নির্লিপ্ত স্বভাবের জন্য। বৈষ্ণবীর মুখে শুনিয়া ও নিজের চোখে দেখিয়া জানিয়াছি—ও লোকটির মধ্যে কপটতা নাই, অনাচার নাই, আর নাই মাষ্টারি করিবার ঝোঁক। বৈষ্ণব-ধর্মগ্রন্থ লইয়া অধিকাংশ সময় তাঁহার নির্জন ঘরের মধ্যে কাটে। ইঁহার ধর্মমতে আমার আস্থাও নাই, বিশ্বাসও নাই, কিন্তু এই মানুষটির কথাগুলি এমন নম্র, চাহিবার ভঙ্গী এমন স্বচ্ছ ও গভীর, বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় অহর্নিশ এমন ভরপুর হইয়া আছেন যে, তাঁহার মত ও পথ লইয়া বিরুদ্ধ আলোচনা করিতে শুধু সঙ্কোচ নয়, দুঃখ বোধ হয়। আপনিই বুঝা যায়, এখানে তর্ক করিতে যাওয়া একেবারে নিষ্ফল। একদিন সামান্য একটুখানি যুক্তির অবতারণা করায় তিনি হাসিমুখে এমন নীরবে চাহিয়া রহিলেন যে কুণ্ঠায় আমার

মুখেও আর কথা রহিল না। তারপর হইতে তাঁহাকে সাধ্যমত এড়াইয়া চলিয়াছি। তবে, একটা কৌতূহল ছিল। এতগুলি নারী-পরিবৃত থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন রসের অনুশীলনে নিমগ্ন রহিয়াও চিত্তের শান্তি ও দেহের নির্মলতা অক্ষুন্ন রাখিয়া চলার রহস্য, ইচ্ছা ছিল যাইবার পূর্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব; কিন্তু সে সুযোগ এ যাত্রায় বোধ করি আর মিলিল না। মনে মনে বলিলাম, আবার যদি কখনো আসা হয় ত তখন দেখা যাইবে।

বৈষ্ণবের মঠেও বিগ্রহ-মূর্তি সচরাচর ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যে স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু এ আশ্রমে সে বিধি ছিল না। ঠাকুরের বৈষ্ণব-পূজারী একজন বাহিরে থাকে, সে আসিয়া যথারীতি আজও পূজা করিয়া গেল, কিন্তু ঠাকুরের সেবার ভার আজ অনেকখানি আসিয়া পড়িল আমার 'পরে। বৈষ্ণবী দেখাইয়া দেয়, আমি করি সব, কিন্তু রহিয়া রহিয়া সমস্ত অন্তর তিক্ত হইয়া উঠে। এ কি পাগলামি আমাকে পাইয়া বসিতেছে! তথাপি আজও যাওয়া বন্ধ রহিল। আপনাকে বোধ হয় এই বলিয়া বুঝাইলাম যে, এতদিন এখানে আছি, এ বিপদে ইহাদের ফেলিয়া যাইব কিরূপে? সংসারে কৃতজ্ঞতা বলিয়াও ত একটা কথা আছে!

আরও দুই দিন কাটিল, কিন্তু আর না। কমললতা সুস্থ হইয়াছে, পদ্ম ও লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই বোনেই সারিয়া উঠিয়াছে। দ্বারিকাদাস গত সন্ধ্যায় ফিরিয়াছেন, তাঁহার কাছে বিদায় লইতে গেলাম। গোঁসাইজী কহিলেন, আজ যাবে গোঁসাই? আবার কবে আসবে?

সে ত জানি নে গোঁসাই।

কমললতা কিন্তু কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যাবে।

আমার কথাটা ইঁহার কানেও গিয়াছে জানিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম; কহিলাম, সে কাঁদতে যাবে কিসের জন্যে?

গোঁসাইজী একটু হাসিয়া বলিলেন, তুমি জানো না বুঝি?

না।

ওর স্বভাবই এমনি। কেউ চলে গেলে ও যেন শোকে সারা হয়ে যায়। কথাটা আরও খারাপ লাগিল, বলিলাম, যার স্বভাব শোক করা সে করবেই। আমি তাকে থামাবো কি দিয়ে? কিন্তু বলিয়াই তাঁহার চোখের পানে চাহিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম আমারই পিছনে দাঁড়াইয়া কমললতা।

দ্বারিকাদাস কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, ওর ওপর রাগ ক'রো না গোঁসাই, শুনেচি ওরা তোমার যত্ন করতে পারে নি, অসুখে পড়ে তোমাকে অনেক খাটিয়েছে, অনেক কষ্ট দিয়েছে। আমার কাছে কাল ও নিজেই বড় দুঃখ করছিলো। আর বোষ্টম-বৈরাগীর আদর যত্ন করবার কিই বা আছে! কিন্তু আবার যদি কখনো তোমার এদিকে আসা হয় ভিখারীদের দেখা দিয়ে যেয়ো। দেবে ত গোঁসাই?

ঘাড় নাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলাম, কমললতা সেইখানে তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল;

কিন্তু অকস্মাৎ এ কি হইয়া গেল! বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে কত কি বলার, কত কি শোনার কল্পনা ছিল, সমস্ত নষ্ট করিয়া দিলাম। চিত্তের দুর্বলতার গ্লানি অন্তরে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল তাহা অনুভব করিতেছিলাম, কিন্তু উত্ত্যক্ত অসহিষ্ণু মন এমন অশোভন রূঢ়তায় যে নিজের মর্যাদা খর্ব করিয়া বসিবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

নবীন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গহরের খোঁজে আসিয়াছে। কাল হইতে এখনও সে গৃহে ফিরে নাই। আশ্চর্য হইয়া গেলাম—সে কি নবীন সে ত এখানে আর আসে না।

নবীন বিশেষ বিচলিত হইল না, বলিল, তবে বোধ হয় কোন বনবাদাড়ে ঘুরচে—নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করেছে—এইবার কখন সাপে কামড়ানোর খবরটা পেলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

তার সন্ধান করা ত দরকার, নবীন?

দরকার ত জানি কিন্তু খুঁজবো কোথায়? বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নিজের প্রাণটা ত আর দিতে পারি নে বাবু; কিন্তু তিনি কোথায়? একবার জিজ্ঞেসা করে যেতে চাই যে?

তিনিটা কে?

ঐ যে কমলিলতা।

কিন্তু সে জানবে কি করে, নবীন?

সে জানে না? সব জানে।

আর বিতর্ক না করিয়া উত্তেজিত নবীনকে মঠের বাহিরে লইয়া আসিলাম, বলিলাম, সত্যিই কমললতা কিছুই জানে না, নবীন। নিজে অসুখে পড়ে তিন-চার দিন সে আখড়ার বাইরেও যায় নি।

নবীন বিশ্বাস করিল না। রাগ করিয়া বলিল. জানে না? ও সব জানে। বোষ্টুমী কি মন্তর জানে—ও পারে না কি? কিন্তু পড়তো একবার নবীনের পাল্লায়, ওর চোখ মুখ ঘুরিয়ে কেত্তন করা বার করে দিতুম। বাপের অতগুলো টাকা ছোঁড়া যেন ভেল্‌কিতে উড়িয়ে দিলে!

তাহাকে শান্ত করার জন্য কহিলাম, কমললতা টাকা নিয়ে কি করবে নবীন? বোষ্টমী মানুষ, মঠে থাকে, গান গেয়ে দুটো ভিক্ষে ক'রে ঠাকুর-দেবতার সেবা করে, দুবেলা দুমুঠো খাওয়া বই ত নয়—ওকে টাকার কাঙাল ব'লে ত আমার বোধ হয় না নবীন।

নবীন কতকটা ঠাণ্ডা হইয়া বলিল, ওর নিজের জন্য নয়, তা আমরাও জানি। দেখলে যেন ভদ্দর ঘরের মেয়ে বলে মনে হয়। যেমনি চেহারা, তেমনি কথাবার্তা, বড়বাবাজীটাও লোভী নয়, কিন্তু একপাল পুষ্যি রয়েছে যে। ঠাকুরসেবার নাম করে তাদের যে লুচি-মণ্ডা ঘি-দুধ নিত্যি চাই! নয়ন চক্কোত্তির মুখে কানাঘুষোয় শুনেচি, আখড়ার নামে বিশ বিঘে জমি নাকি খরিদ হয়ে গেছে। কিছুই থাকবে না বাবু, যা

আছে সব বৈরাগীদের পেটে গিয়েই একদিন ঢুকবে।

বলিলাম, হয়ত গুজোব, সত্যি নয়, কিন্তু সে-পক্ষে তোমাদের নয়ন চক্কোত্তিও ত কম নয়, নবীন।

নবীন সহজেই স্বীকার করিয়া কহিল, সে ঠিক। বিট্‌লে বামুন মস্ত ধড়িবাজ। কিন্তু বিশ্বেস না করি কি করে বলুন। সেদিন খামোকা আমার ছেলেদের নামে দশ বিঘে জমি দানপত্তর করে দিলে। অনেক মানা করলুম, শুনলে না। বাপ বহুত রেখে গেছে মানি, কিন্তু বিলোলে ক'দিন বাবু? একদিন বললে কি জানেন? বললে, আমরা ফকিরের বংশ, ফকিরি আমার ত কেউ ঠকিয়ে নিতে পারবে না? শুনুন কথা।

নবীন চলিয়া গেল। একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, আমি কিসের জন্য যে এতদিন মঠে পড়িয়া আছি এ কথা সে জিজ্ঞাসাও করিল না। জিজ্ঞাসা করিলেই যে কি বলিতাম জানি না, কিন্তু মনে মনে লজ্জা পাইতাম। তাহার কাছেই আরও একটা খবর পাইলাম কালিদাসবাবুর ছেলের ঘটা করিয়া বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সাতাশে তারিখটা আমার খেয়াল ছিল না।

নবীনের কথাগুলো মনে মনে তোলাপাড়া করিতে অকস্মাৎ বিদ্যুৎবেগে একটা সন্দেহ জাগিল - বৈষ্ণবী কিসের জন্য চলিয়া যাইতে চায়। সেই ভুরুওয়ালা কদাকার লোকটার কণ্ঠীবদলকরা স্বামিত্বেই হাঙ্গামার ভয়ে কদাচ নয়—এ গহর। এখানে আমার থাকার সম্বন্ধে তাই বোধ করি বৈষ্ণবী সেদিন সকৌতুকে বলিয়াছিল, আমি ধরে রাখলে সে রাগ করবে না গোঁসাই। রাগ করবার লোক সে নয়, কিন্তু সে আর আসে না? হয়ত বা নিজের মনে মনে কি কথা সে ভাবিয়া লইয়াছে। সংসারে গহরের আসক্তি নাই, আপন বলিতেও কেহ নাই। টাকাকড়ি বিষয়-আশয় সে যেন বিলাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচে। ভালো যদি সে বাসিয়াও থাকে, মুখ ফুটিয়া কোন দিন হয়ত সে বলিবেও না কোথাও পাছে কোন অপরাধ স্পর্শে। বৈষ্ণবী ইহা জানে। সেই অনতিক্রম্য বাধায় চির-নিষিদ্ধ প্রণয়ের নিষ্ফল চিত্তদাহ হইতে এই শান্ত আত্মভোলা মানুষটিকে অব্যাহতি দিতেই বোধ করি কমললতা পলাইতে চায়। নবীন চলিয়া গিয়াছে, বকুলতলার সেই ভাঙা বেদিটার উপরে একলা বসিয়া ভাবিতেছি। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, পাঁচটার গাড়ি ধরিতে গেলে দেরি করা আর চলে না; কিন্তু প্রতিদিন না যাওয়াটায় এমনি অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছিল যে ব্যস্ত হইয়া উঠিব কি, আজও মন পিছু হটিতে লাগিল।

যেখানেই থাকি পটুর বৌভাতে অন্ন গ্রহণ করিয়া যাইব কথা দিয়াছিলাম। নিরুদ্দিষ্ট গহরের তত্ত্ব লওয়া আমার কর্তব্য। এতদিন অনাবশ্যক অনুরোধ অনেক মানিয়াছি, কিন্তু আজ সত্যকার কারণ যখন বিদ্যমান, তখন মানা করিবার কেহ নাই। দেখি পদ্মা আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল, তোমাকে দিদি একবার ডাকচে গোঁসাই।

আবার ফিরিয়া আসিলাম। প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বৈষ্ণবী কহিল, কলকাতার বাসায় পোঁছুতে তোমার রাত হবে, নতুনগোঁসাই। ঠাকুরের প্রসাদ দুটি সাজিয়ে রেখেচি, ঘরে এসো।

প্রত্যহের মতোই সযত্ন আয়োজন। বসিয়া গেলাম। এখানে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করার প্রথা নাই, আবশ্যক হইলে চাহিয়া লইতে হয়, উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া রাখা চলে না।

যাবার সময়ে বৈষ্ণবী কহিল, নতুনগোঁসাই, আবার আসবে ত?

তুমি থাকবে ত?

তুমি বলো কতদিন আমাকে থাকতে হবে?

তুমিও বলো কতদিনে আমাকে আসতে হবে?

না, সে তোমাকে আমি বলবো না।

না বলো অন্য একটা কথার জবাব দেবে বলো?

এবার বৈষ্ণবী একটুখানি হাসিয়া কহিল, না সেও তোমাকে আমি বলবো না। তোমার যা ইচ্ছে হয় ভাবো গে গোঁসাই, একদিন আপনিই তার জবাব পাবে।

অনেকবার মুখে আসিয়া পড়িতে চাহিল—আজ আর সময় নেই কমললতা, কাল যাবো—কিন্তু কিছুতেই এ কথা বলা হ'ল না!

চললাম।

পদ্মা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। কমললতার দেখাদেখি সে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। বৈষ্ণবী তাহাতে রাগ করিয়া বলিল, হাত তুলে নমস্কার কিরে পোড়ারমুখী, পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম কর্।

কথাটায় যেন চমক লাগিল। তাহার মুখের পানে চাহিতে গিয়া দেখিলাম সে তখন আর একদিকে মুখ ফিরাইয়াছে। আর কোন কথা না বলিয়া তাহাদের আশ্রম ছাড়িয়া তখন বাহির হইয়া আসিলাম।

॥ পাঁচ ॥

আজ অবেলায় কলিকাতার বাসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি। তারপরে এর চেয়েও দুঃখময়—বর্মায় নির্বাসন। ফিরিয়া আসিবার হয়ত আর সময়ও হইবে না, প্রয়োজনও ঘটিবে না। হয়ত এই যাওয়াই শেষের যাওয়া। গণিয়া দেখিলাম আজ দশদিন। দশটা দিন জীবনের কতটুকুই বা। তথাপি মনের মধ্যে সন্দেহ নাই, দশদিন পূর্বে যে-আমি এখানে আসিয়াছিলাম এবং যে-আমি বিদায় লইয়া আজ চলিয়াছি, তাহারা এক নয়।

অনেককেই সখেদে বলিতে শুনিয়াছি, অমুক যে এমন হইতে পারে তাহা কে

ভাবিয়াছে। অর্থাৎ অমুকের জীবনটা যেন সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের মতো তাহার অনুমানের পাঁজিতে লেখা নির্ভুল হিসাব! গরমিলটা শুধু অভাবিত নয়, অন্যায়। যেন তাহার বুদ্ধির আঁকজোকার বাহিরে দুনিয়ায় আর কিছু নাই। জানেও না সংসারে কেবল বিভিন্ন মানুষই আছে তাই নয়; একটা মানুষই যে কত বিভিন্ন মানুষে রূপান্তরিত হয়, তাহার নির্দেশ খুঁজিতে যাওয়া বৃথা; এখানে একটা নিমেষও তীক্ষ্মতায়, তীব্রতায় সমস্ত জীবনকেও অতিক্রম করিতে পারে।

সোজা রাস্তা ছাড়িয়া বনবাদাড়ের মধ্য দিয়া এ-পথ ও-পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্টেশনে চলিয়াছিলাম, অনেকটা ছেলেবেলায় পাঠশালে যাইবার মতো। ট্রেনের সময় জানি না, তাগিদও নাই—শুধু জানি ওখানে পৌঁছিলে যখন হোক গাড়ি একটা জুটিবেই। চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময়ে মনে হইল সব পথগুলাই যেন চেনা। যেন কতদিন এ পথে কতবার আনাগোনা করিয়াছি। শুধু আগে ছিল সেগুলো বড়, এখন কি করিয়া যেন সঙ্কীর্ণ এবং ছোট্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ঐ না খাঁয়েদের গলায়-দড়ির বাগান? তাইত বটে! এ যে আমাদেরই গ্রামে দক্ষিণপাড়ার শেষপ্রান্ত দিয়া চলিয়াছি। কে নাকি কবে শূলের ব্যথায় ঐ তেঁতুল গাছের উপরের ডালে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। করিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু প্রায় সকল গ্রামের মতো এখানেও একটা জনশ্রুতি আছে। গাছটা পথের ধারে, ছেলেবেলায় চোখে পড়িলে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিত এবং চোখ বুজিয়া সবাই একদৌড়ে স্থানটা পার হইয়া যাইতাম।

গাছটা তেমনই আছে। তখন মনে হইত ঐ অপরাধী গাছটার গুঁড়িটা যেন পাহাড়ের মতো, মাথা গিয়া ঠেকিয়াছে আকাশে। আজ দেখিলাম সে বেচারার গর্ব করিবার কিছু নাই, আরও পাঁচটা তেঁতুল গাছ যেমন হয় সেও তেমনি। জনহীন পল্লীপ্রান্তে একাকী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। শৈশবে একদিন যাহাকে সে যথেষ্ট ভয় দেখাইয়াছে, আজ বহুবর্ষ পরে প্রথম সাক্ষাতে তাহাকেই সে যেন বন্ধুর মতো চোখ টিপিয়া একটুখানি রহস্য করিল—কি ভাই বন্ধু, কেমন আছো? ভয় করে না ত?

কাছে গিয়া পরম স্নেহে একবার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া লইলাম, মনে মনে বলিলাম, ভালো আছি ভাই। ভয় করবে কেন, তুমি যে আমার ছেলেবেলার প্রতিবেশী, আমার আত্মীয়।

সায়াহ্নের আলো নিবিয়া আসিতেছিল, বিদায় লইয়া বলিলাম, ভাগ্য ভালো যে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল। চললাম বন্ধু।

সারি সারি অনেকগুলো বাগানের পরে একটুখানি খোলা জায়গা, অন্যমনে হয়ত একটু পার হইয়া আসিতাম, কিন্তু সহসা বহুদিনের বিস্মৃত প্রায় পরিচিত ভারি একটি মিষ্ট গন্ধে চমক লাগিল—এদিক ওদিক চাহিতেই চোখে পড়িয়া গেল—বাঃ এ যে আমাদের সেই যশোদা বৈষ্ণবীর আউশ ফুলের গন্ধ! ছেলেবেলায় ইহার জন্য যশোদার কত উমেদারিই না করিয়াছি। এ জাতীয় গাছ এদিকে মিলে না, কি জানি সে কোথা

হইতে আনিয়া তাহার আঙিনার একধারে পুঁতিয়াছিল। ট্যারা-বাঁকা গাঁটেভরা বুড়ো মানুষের মতো তাহার চেহারা—সেদিনের মতো আজও তাহার সেই একটিমাত্র সজীব শাখা এবং উর্ধ্বে গুটিকয়েক সবুজ পাতার মধ্যে তেমনি গুটিকয়েক সাদা সাদা ফুল। ইহার নীচে ছিল যশোদার স্বামীর সমাধি। বোষ্টমঠাকুরকে আমরা দেখি নাই, আমাদের জন্মের পূর্বেই তিনি গোলোকে রওনা হইয়াছিলেন। তাহারই ছোট্ট মনোহারী দোকানটি তখন বিধবা চালাইত। দোকান ত নয়, একটি ডালায় ভরিয়া যশোদা মালা-ঘুন্‌সি, আর্শি-চিরুণী, আলতা, তেলের মশলা, কাচের পুতুল, টিনের বাঁশি প্রভৃতি লইয়া দুপুরবেলায় বাড়ি বাড়ি বিক্রি করিত। আর ছিল তাহার মাছ ধরিবার সাজ-সংগ্রাম। বড়ো ব্যাপার নয়, দু-এক পয়সা মূল্যের ডোর-কাঁটা। এই জিনিতে যখন-তখন তাহার ঘরে গিয়া আমরা উৎপাত করিতাম। এই আউশ গাছের একটা শুকনো ডালের উপর কাদা দিয়া জায়গা করিয়া যশোদা সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দিত। ফুলের জন্য আমরা উপদ্রব করিলে সে সমাধিটি দেখাইয়া বলিত, না বাবাঠাকুর, ও আমার দেবতার ফুল, তুললে তিনি রাগ করেন।

বৈষ্ণবী নাই, সে কবে মরিয়াছে জানি না—হয়ত খুব বেশিদিন নয়। চোখে পড়িল, গাছের একধারে আর একটি ছোট মাটির ঢিপি, বোধ হয় যশোদারই হইবে। খুব সম্ভব, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আজ স্বামীর পাশেই সে একটু স্থান করিয়া লইয়াছে। স্তূপের খোঁড়া মাটি অধিকতর উর্বর হইয়া বিছুটি ও বনচাঁড়ালের গাছে গাছে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে—যত্ন করিবার কেহ নাই।

পথ ছাড়িয়া সেই শৈশবের পরিচিত বুড়ো গাছটির কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি, সন্ধ্যা দেওয়া সেই দীপটি আছে নীচে পড়িয়া, এবং তাহারি উপরে সেই শুকনো ডালটি আছে আজও তেমনি তেলে কালো হইয়া।

যশোদার ছোট্ট ঘরটি এখনো সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হয় নাই—সহস্র ছিদ্রময় শতজীর্ণ-খড়ের চালখানি দ্বার ঢাকিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আজও প্রাণ-পণে আগলাইয়া আছে।

কুড়ি-পঁচিশ বর্ষ পূর্বের কত কথাই মনে পড়িল। কঞ্চির বেড়া দিয়া ঘেরা নিকানো-মুছানো যশোদার উঠান, আর সেই ছোট ঘরখানি। সে আজ এই হইয়াছে; কিন্তু এর চেয়েও ঢের বড় করুণ বস্তু তখনও দেখার বাকি ছিল। অকস্মাৎ চোখে পড়িল সেই ঘরের মধ্য হইতে ভাঙা চালের নীচে দিয়া গুঁড়ি মারিয়া একটা কঙ্কালসার কুকুর বাহির হইয়া আসিল। আমার পায়ের শব্দে চকিত হইয়া সে বোধ করি অনধিকার প্রবেশের প্রতিবাদ করিতে চায়! কিন্তু কণ্ঠ এত ক্ষীণ যে, সে তাহার মুখেই বাধিয়া রহিল।

বলিলাম, কি রে, কোন অপরাধ করি নি ত?

সে আমার মুখের পানে চাহিয়া কি ভাবিয়া জানি না এবার ল্যাজ নাড়িতে লাগিল।

বলিলাম, আজও তুই এখানেই আছিস্?

প্রত্যুত্তরে সে শুধু মলিন চোখ দুটো মেলিয়া অত্যন্ত নিরুপায়ের মতো আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এ যে যশোদার কুকুর তাহাতে সন্দেহ নাই। ফুলকাটা রাঙা পাড়ের সেলাই করা বগ্‌লস এখনো তাহার গলায়। নিঃসন্তান রমণীর একান্ত স্নেহের ধন কুকুরটা একাকী এই পরিত্যক্ত কুটীরের মধ্যে কি খাইয়া যে আজও বাঁচিয়া আছে ভাবিয়া পাইলাম না। পাড়ায় ঢুকিয়া কাড়িয়া কুড়িয়া খাওয়ার ইহার জোরও নাই, অভ্যাসও নাই, স্বজাতির সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার শিক্ষাও এ পায় নাই—অনশনে অর্ধাসনে এইখানে পড়িয়াই এ বেচারা বোধ হয় তাহারই পথ চাহিয়া আছে যে তাহাকে একদিন ভালবাসিত। হয়ত ভাবে কোথাও না কোথাও গিয়াছে, ফিরিয়া একদিন সে আসিবেই। মনে মনে বলিলাম, এ-ই কি এমনি? এ প্রত্যাশা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা সংসারে এতই কি সহজ?

যাইবার পূর্বে চালের ফাঁক দিয়া ভিতরটায় একবার দৃষ্টি দিয়া লইলাম। অন্ধকারে দেখা কিছুই গেল না, শুধু চোখে পড়িল দেয়ালে সাঁটা পটগুলি। রাজা রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা জাতীয় দেবদেবতার প্রতিমূর্তি নূতন কাপড়ের পাট হইতে সংগ্রহ করিয়া যশোদা ছবির সখ মিটাইত। মনে পড়িল ছেলেবেলায় মুগ্ধ চক্ষে এগুলি বহুবার দেখিয়াছি। বৃষ্টির ছাটে ভিজিয়া, দেওয়ালের কাদা মাখিয়া এগুলি আজও কোনমতে টিঁকিয়া আছে।

আর রহিয়াছে পাশের কুলুঙ্গিতে তেমনি দুর্দশায় পড়িয়া সেই রঙ করা হাঁড়িটি। এর মধ্যে থাকিত তাহার আলতার বাণ্ডিল, দেখামাত্রই সে কথা আমার মনে পড়িল। আরও কি কি যেন এদিকে ওদিকে পড়িয়া আছে, অন্ধকারে ঠাহর হইল না। তাহারা সবাই মিলিয়া আমাকে প্রাণপণে কিসের যেন ইঙ্গিত করিতে লাগিল, কিন্তু সে ভাষা আমার অজানা। মনে হইল, বাড়ির এক কোণে এ যেন মৃত-শিশুর পরিত্যক্ত খেলাঘর। গৃহস্থালির নানা ভাঙাচোরা জিনিস দিয়া সযত্নে রচিত তাহার এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে সে ফেলিয়া গিয়াছে। আজ তাহাদের আদর নাই, প্রয়োজন নাই, আঁচল দিয়া বার বার ঝাড়া-মোছা করিবার তাগিদ গিয়াছে ফুরাইয়া—পড়িয়া আছে শুধু কেবল জঞ্জালগুলো কেহ মুক্ত করে নাই বলিয়া।

সেই কুকুরটা একটুখানি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া থামিল। যতক্ষণ দেখা গেল দেখিলাম সে-বেচারা এইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সহিত পরিচয়ও এই প্রথম, শেষও এইখানে তবু আগু বাড়াইয়া বিদায় দিতে আসিয়াছে। আমি চলিয়াছি কোন্ বন্ধুহীন, লক্ষ্যহীন প্রবাসে, আর সে ফিরিবে তাহার অন্ধকার নিরালা ভাঙা ঘরে। এ সংসারে পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে উভয়েরই কেহ নাই।

বাগানটার শেষে সে চোখের আড়ালে পড়িল, কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের এই অভাগ্য সঙ্গীর জন্য বুকের ভিতরটা হঠাৎ হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, চোখের জল আর সামলাইতে পারি না এমনি দশা।

চলিতে চলিতে ভাবিতেছিলাম—কেন এমন হয়? আর কোন একটা দিনে এসব

দেখিয়া হয়ত বিশেষ কিছু মনে হইত না, কিন্তু আজ আপন অন্তরাকাশই নাকি মেঘের ভারে ভারাতুর, তাই ওদের দুঃখের হাওয়ায় তাহারা অজস্র ধারায় ফাটিয়া পড়িতে চায়।

স্টেশনে পৌঁছিলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তখনই গাড়ি মিলিল। কলিকাতার বাসায় পৌঁছিতে অধিক রাত্রি হইবে না। টিকিট কিনিয়া উঠিয়া বসিলাম, বাঁশি বাজাইয়া সে যাত্রা শুরু করিল। স্টেশনের প্রতি তাহার মোহ নাই, সজল চক্ষে বার বার ফিরিয়া চাহিবার তাহার প্রয়োজন হয় না।

আবার সেই কথাটাই মনে পড়িল দশটা দিন মানুষের জীবনে কতটুকু, অথচ কতই না বড়!

কাল প্রভাতে কমললতা একলা যাইবে ফুল তুলিতে। তারপরে চলিবে তাহার সারাদিনের ঠাকুরসেবা। কি জানি, দিন-দশেকের সাথী নতুনগোঁসাইকে ভুলিতে তাহার কটা দিন লাগিবে!

সেদিন সে বলিয়াছিল, সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদপদ্মে নিজেকে নিবেদন করে দিয়েছি, দাসীকে কখনো তিনি পরিত্যাগ করবেন না।

তাই হোক। তাই যেন হয়।

ছেলেবেলা হইতে নিজের জীবনের কোন লক্ষ্যও নাই, জোর করিয়া কোনো-কিছু কামনা করিতেও জানি না—সুখ-দুঃখের ধারণাও আমার স্বতন্ত্র। তথাপি, এতটা কাল কাটান শুধু পরের দেখাদেখি, পরের বিশ্বাসে ও পরের হুকুম তামিল করিতে। তাই কোন কাজই আমাকে দিয়া সুনির্বাহিত হয় না। দ্বিধায় দুর্বল সকল সংকল্প সকল উদ্যমই আমার অনতিদূরে ঠোকর খাইয়া পথের মধ্যে ভাঙিয়া পড়ে। সবাই বলে অলস, সবাই বলে অকেজো। তাই বোধ করি ওই অকেজো বৈরাগীদের আখড়াতেই আমার অন্তরবাসী অপরিচিত বন্ধু অস্ফুট ছায়ারূপে আমাকে দেখা দিয়া গেলেন। বার বার রাগ করিয়া মুখ ফিরাইলাম, বার বার স্মিতহাস্যে হাত নাড়িয়া কি যেন ইঙ্গিত করিলেন।

আর ঐ বৈষ্ণবী কমললতা! ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান। ওর ছন্দের মিল নাই, ব্যাকরণে ভুল আছে, ভাষায় ত্রুটি অনেক, কিন্তু ওর বিচার ত সেদিক দিয়া নয়। ও যেন তাহাদেরই দেওয়া কীর্তনের সুর—মর্মে যাহার পাশে সে-ই শুধু তাহার খবর পায়। ও যেন গোধূলি আকাশে নানা রঙের ছবি। ওর নাম নাই, সংজ্ঞা নাই—কলাশাস্ত্রের সূত্র মিলাইয়া ওর পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।

আমাকে বলিয়াছিল, চলো না গোঁসাই এখান থেকে যাই, গান গেয়ে পথে-পথে দুজনের দিন কেটে যাবে।

বলিতে তাহার বাধে নাই কিন্তু আমার বাধিল। আমার নাম ছিল যে নতুনগোঁসাই। বলিল, ও নামটা আমাকে যে মুখে আনতে নেই গোঁসাই। তাহার বিশ্বাস আমি তাহার গত জীবনের বন্ধু। আমাকে তাহার ভয় নাই, আমার কাছে সাধনায় তাহার

বিঘ্ন ঘটিবে না। বৈরাগী দ্বারিকাদাসের শিষ্যা সে, কি জানি কোন্ সাধনায় সিদ্ধিলাভের মন্ত্র তিনি দিয়াছিলেন।

অকস্মাৎ রাজলক্ষ্মীকে মনে পড়িল—মনে পড়িল তাহার সেই চিঠি। স্নেহে ও স্বার্থে মিশামিশি সেই কঠিন লিপি। তবুও জানি এ জীবনের পূর্ণচ্ছেদে সে আমার শেষ হইয়াছে। হয়ত এ ভালোই হইয়াছে, কিন্তু সে শূন্যতা ভরিয়া দিতে কি কোথায় কেহ আছে? জানালার বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। একে একে কত কথা, কত ঘটনাই স্মরণ হইল। শিকারের আয়োজনে কুমার সাহেবের সেই তাঁবু, সেই দলবল, বহুবর্ষ পরে প্রবাসে প্রথম সাক্ষাতের দিন দীপ্ত কালো চোখে তাহার সে কি বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি! যে মরিয়াছে বলিয়া জানিতাম, তাহাকে চিনিতে পারি নাই—সেদিন শ্মশান-পথে তাহার সে কি বাগ্র-ব্যাকুল মিনতি! শেষে রুদ্ধ হত্যাশ্বাসে কি তীব্র অভিমান! পথরোধ করিয়া কহিল, যাবে বললেই তোমাকে যেতে দেবো নাকি? কই যাও ত দেখি! এই বিদেশে বিপদ ঘটলে দেখবে কে? ওরা না আমি! এবার তাহাকে চিনিলাম এই জোরই তাহার চিরদিনের সত্য পরিচয়। জীবনে এ আর তাঁহার ঘুচিল না—এ হইতে কখনো কেহ তাহার কাছে অব্যাহতি পাইল না।

আবার পথের প্রান্তে মরিতে বসিয়াছিলাম, ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিয়া দেখিলাম শিয়রে বসিয়া সে। তখন সকল চিন্তা সঁপিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া শুইলাম। সে ভার তাহার, আমার নয়।

দেশের বাড়িতে আসিয়া জ্বরে পড়িলাম, এখানে সে আসিতে পারে না—এখানে সে মৃত—এর বাড়া লজ্জা তাহার নাই, তথাপি যাহাকে কাছে পাইলাম সে ওই রাজলক্ষ্মী।

চিঠিতে লিখিয়াছে—তখন তোমাকে দেখিবে কে? পুঁটু? আর আমি ফিরিব শুধু চাকরের মুখে খবর লইয়া? তারপরেও বাঁচিতে বলো নাকি?

এ প্রশ্নের জবাব দিই নাই। জানি না বলিয়া নয়—সাহস হয় নাই।

মনে মনে বলিলাম, শুধু কি রূপে? সংযমে, শাসনে, সুকঠোর আত্ম-নিয়ন্ত্রণে এই প্রখর বুদ্ধিশালিনীর কাছে ঐ স্নিগ্ধ সুকোমল আশ্রমবাসিনী কমললতা কতটুকু? কিন্তু ওই এতটুকুর মধ্যেই এবার যেন আপন স্বভাবের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছি। মনে হইয়াছে ওর কাছে আছে আমার মুক্তি, আছে মর্যাদা, আছে আমার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ! ও কখনো আমার সকল চিন্তা, সকল ভালোমন্দ আপন হাতে লইয়া রাজলক্ষ্মীর মতো আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে না।

ভাবিতেছিলাম কি করিব বিদেশে গিয়া। কি হইবে আমার চাকরীতে। নূতন ত নয়—সেদিনেই বা কি এমন পাইয়াছিলাম যাহাকে ফিরিয়া পাইতে আজ লোভ করিতে হইবে? কেবল কমললতাই বলে নাই, দ্বারিকাগোঁসাইও একান্ত সমাদরে আহ্বান করিয়াছিল আশ্রমে থাকিতে। সে কি সমস্তই বঞ্চনা, মানুষকে ঠকানো ছাড়া কি এ

আমন্ত্রণে কোন সত্যই নাই? এতকাল জীবনটা কাটিল যে ভাবে, এই কি ইহার শেষ কথা? কিছুই কি জানিতে বাকি নাই, সব জানাই কি আমার সমাপ্ত হইয়াছে? চিরদিন ইহাকে শুধু অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষাই করিয়াছি, বলিয়াছি সব ভুয়া, সব ভুল, কিন্তু কেবলমাত্র অবিশ্বাস উপহাসকেই মূলধন করিয়া সংসারে বৃহৎ বস্তু কে কবে লাভ করিয়াছে?

গাড়ি আসিয়া হাওড়া স্টেশনে থামিল। স্থির করিলাম রাত্রিটা বাসায় থাকিয়া জিনিসপত্র যা-কিছু আছে, দেনা-পাওনা যা-কিছু বাকি সমস্তই চুকাইয়া দিয়া কালই আবার আশ্রমে ফিরিয়া যাইব; রহিল আমার চাকরী, রহিল আমার বর্মা যাওয়া।

বাসায় পৌঁছিলাম—রাত্রি তখন দশটা। আহারের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু উপায় ছিল না। হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া লইতেছিলাম, পিছনে সুপরিচিত কন্ঠের ডাক আসিল, বাবু এলেন?

সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিলাম—রতন কখন এলি রে?

এসেছি সন্ধ্যাবেলায়। বারান্দায় তোফা হাওয়া—আলিস্যিতে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বেশ করেছিলে! খাওয়া হয় নি ত?

আজ্ঞে না।

তবেই দেখচি মুস্কিলে ফেলালি রতন।

রতন জিজ্ঞাসা করিল, আপনার?

স্বীকার করিতে হইল, আমারও হয় নাই।

রতন খুশি হইয়া কহিল, তবে ত ভালই হয়েছে। আপনার প্রসাদ পেয়ে রাতটুকু কাটিয়ে দিতে পারবো।

মনে মনে বলিলাম, ব্যাটা নাপ্‌তে বিনয়ের অবতার। কিছুতেই অপ্রতিভ হয় না। মুখে বলিলাম, তা হলে কাছাকাছি কোন দোকানে খুঁজে দ্যাখ যদি প্রসাদের যোগাড় করে আনতে পারিস্, কিন্তু শুভাগমন হলো কিসের জন্যে? আবার চিঠি আছে নাকি?

রতন কহিল আজ্ঞে না। চিঠি লেখালিখিতে অনেক ভজকটো। যা বলবার তিনি মুখেই বলবেন।

তার মানে? আবার আমাকে যেতে হবে নাকি?

আজ্ঞে না। মা নিজেই এসেচেন।

শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। এই রাত্রে কোথায় রাখি, কি বন্দোবস্ত করি ভাবিয়া পাইলাম না; কিন্তু কিছু ত একটা করা চাই, জিজ্ঞাসা করিলাম, এসে পর্যন্ত কি ঘোড়ার গাড়িতেই বসে আছেন নাকি?

রতন হাসিয়া কহিল, মা সেই মানুষই বটে। না বাবু, আমরা চারদিন হলো এসেছি—এই চারটে দিনই আপনাকে দিনরাত পাহারা দিচ্চি। চলুন।

কোথায়? কতদূরে?

দূরে একটু বটে, কিন্তু আমার গাড়ি ভাড়া করা আছে, কষ্ট হবে না !

অতএব আর একদফা জামাকাপড় পরিয়া দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যাত্রা করিতে হইল। শ্যামবাজারে কোন্ একটা গলির মধ্যে একখানি দোতলা বাড়ি, সম্মুখে প্রাচীর ঘেরা একটুখানি ফুলের বাগান, রাজলক্ষ্মীর বুড়া দরওয়ান দ্বার খুলিয়াই আমাকে দেখিতে পাইল ; তাহার আনন্দের সীমা নাই—ঘাড় নাড়িয়া মস্ত নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবুজি ?

বলিলাম, হাঁ তুলসীদাস, ভালো আছি। তুমি ভালো আছো ?

প্রত্যুত্তরে সে তেমনি আর একটা নমস্কার করিল। তুলসী মুঙ্গের জেলার লোক, জাতিতে কুর্মী, ব্রাহ্মণ বলিয়া আমাকে সে বরাবর বাঙলা রীতিতে পা ছুঁইয়া প্রণাম করে।

আর একজন হিন্দুস্থানী চাকর আমাদের শব্দসাড়ায় বোধ করি সেইমাত্র ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছে, রতনের প্রচণ্ড তাড়ায় সে বেচারা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। অকারণে অপরকে ধমক দিয়া রতন এ বাড়িতে আপন মর্যাদা বহাল রাখে। বলিল, এসে পর্যন্ত কেবল ঘুম মারচো আর রুটি সাঁটচো বাবা, তামাকটুকু পর্যন্ত সেজে রাখতে পারো নি ? যাও জলদি—

এ লোকটি নূতন, ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

উপরে উঠিয়া সুমুখের বারান্দা পার হইয়া একখানি বড় ঘর—গ্যাসের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত—আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপরে ফুলকাটা জাজিম ও গোটা দুই তাকিয়া। কাছেই আমার বহু ব্যবহৃত, অত্যন্ত প্রিয় গুড়গুড়িটি এবং ইহারই অদূরে সযত্নে রাখা আমার জরির কাজ-করা মখমলের চটি। এটি রাজলক্ষ্মীর নিজের হাতে বোনা, পরিহাসচ্ছলে আমার একটা জন্মদিনে সে উপহার দিয়াছিল। পাশের ঘরটিও খোলা, এ ঘরেও কেহ নাই। খোলা দরজার ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিলাম, একধারে নূতন কেনা খাটের উপরে বিছানা পাতা। আর একধারে তেমনি নূতন আলনায় সাজানো শুধু আমারই কাপড়জামা। গঙ্গামাটিতে যাইবার পূর্বে এগুলি তৈরী হইয়াছিল। মনেও ছিল না, কখনো ব্যবহারেও লাগে নাই।

রতন ডাকিল, মা।

যাই, বলিয়া সাড়া দিয়া রাজলক্ষ্মী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, রতন, তামাক নিয়ে আয় বাবা। তোকেও এ ক'দিন অনেক কষ্ট দিলুম।

কষ্ট কিছুই নয় মা। সুস্থ দেহে ওঁকে যে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে পেরেছি এই আমার ঢের ! এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মীকে নূতন চোখে দেখিলাম। দেহে রূপ ধরে না। সেদিনের পিয়ারীকে মনে পড়িল, শুধু কয়েকটা বছরের দুঃখ-শোকের ঝড়-জলে স্নান করিয়া যেন সে নব-কলেবর ধরিয়া আসিয়াছে। এই দিন-চারেকের নূতন বাড়িটার বিধি-ব্যবস্থায় বিস্মিত হই নাই, কারণ তাহার একটা বেলার গাছতলার বাসাও সুশৃঙ্খলায়

সুন্দর হইয়া উঠে ; কিন্তু রাজলক্ষ্মী আপনাকে আপনি যেন এই ক'দিনেই ভাঙিয়া গড়িয়াছে। আগে সে অনেক গহনা পরিত, মাঝখানে—সমস্ত খুলিয়া ফেলিল —যেন সন্ন্যাসিনী। আজ আবার পরিয়াছে—গোটা কয়েক মাত্র—কিন্তু দেখিয়া মনে হইল সেগুলো অতিশয় মূল্যবান। অথচ পরনের কাপড়খানা দামী নয়—সাধারণ মিলের শাড়ি—আটপৌরে, ঘরে পরিবার। মাথার আঁচলের পাড়ের নীচে দিয়া ছোট চুল গালের আশেপাশে ঝুলিতেছে, ছোট বলিয়াই বোধ হয় তাহারা শাসন মানে নাই। দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কি অতো দেখচো ?

দেখচি তোমাকে।

নতুন নাকি ?

তাইত মনে হচ্ছে।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো ?

না।

মনে হচ্ছে রতন তামাক নিয়ে আসবার আগে আমার হাত দুটো তোমার গলায় জড়িয়ে দিই। দিলে কি করবে বলো ত ?—বলিয়াই হাসিয়া উঠিল, কহিল ছুঁড়ে ফেলে দেবে না ত ?

আমিও হাসি রাখিতে পারিলাম না, বলিলাম, দিয়েই দেখো না ! কিন্তু, এত হাসি—সিদ্ধি খেয়েচো নাকি ?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। বুদ্ধিমান রতন একটু জোর করিয়াই পা ফেলিয়া উঠিতেছিল। রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া চুপি চুপি বলিল, রতন আগে যাক, তারপরে তোমাকে দেখাচ্চি সিদ্ধি খেয়েচি কি আর কিছু খেয়েচি।...কিন্তু—বলিতে বলিতেই তাহার গলা হঠাৎ ভারী হইয়া উঠিল, কহিল, এই অজানা জায়গায় চার-পাঁচদিন আমাকে একলা ফেলে রেখে তুমি পুঁটুর বিয়ে দিতে গিয়েছিলে ? জানো, রাতদিন আমার কি করে কেটেচে ?

হঠাৎ তুমি আসবে আমি জানবো কি করে ?

হাঁ গো হাঁ, হঠাৎ বইকি ! তুমি সব জানতে। শুধু আমাকে জব্দ করার জন্যেই চলে গিয়েছিলে।

রতন আসিয়া তামাক দিল, বলিল, কথা আছে মা, বাবুর প্রসাদ পাবো। ঠাকুরকে খাবার আনতে বলে দেবো ? রাত বারোটা হয়ে গেল।

বারোটা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া উঠিল—ঠাকুর পারবে না বাবা, আমি নিজে যাচ্ছি। তুই আমার শোবার ঘরে একটা জায়গা করে দে।

খাইতে বসিয়া আমার গঙ্গামাটির শেষের দিনগুলোর কথা মনে পড়িল। তখন এই ঠাকুর ও এই রতনই আমার খাবার তত্ত্বাবধান করিত। তখন রাজলক্ষ্মীর খোঁজ লইবার সময় হইত না। আজ কিন্তু ইহাদের দিয়া চলিবে না—রান্নাঘরে তাহার নিজের যাওয়া চাই ; কিন্তু এইটাই তাহার স্বভাব, এটা ছিল বিকৃত। বুঝিলাম, কারণ যাহাই

হোক, আবার সে আপনাকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

খাওয়া সাঙ্গ হইলে রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, পুঁটুর বিয়ে কেমন হলো?

বলিলাম, চোখে দেখি নি, কানে শুনেচি ভালোই হয়েছে!

চোখে দেখ নি? এতদিন তবে ছিলে কোথায়?

বিবাহের সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। শুনিয়া সে ক্ষণকাল গালে হাত দিয়া থাকিয়া কহিল, অবাক্ করলে। আসবার আগে পুঁটুকে কিছু একটা যৌতুক দিয়েও এলে না?

সে আমার হয়ে তুমি দিও।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমার হয়ে কেন, নিজের হয়েই মেয়েটাকে কিছু পাঠিয়ে দেবো; কিন্তু ছিলে কোথায় বললে না?

বলিলাম, মুরারিপুরে বাবাজীদের আখড়ার কথা মনে আছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আছে বইকি। বোষ্টুমীরা ওখান থেকেই ত পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করতে আসতো। ছেলেবেলার কথা আমার খুব মনে আছে।

সেইখানেই ছিলাম!

শুনিয়া যেন রাজলক্ষ্মীর গায়ে কাঁটা দিল—বোষ্টমদের আখড়ায়? মা গো মা—বল কি গো? তাদের যে শুনেছি সব ভয়ংকর ইল্লুতে কাণ্ড! কিন্তু বলিয়াই সহসা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া ফেলিল। শেষে মুখে আঁচল চাপিয়া কহিল, তা তোমার অসাধ্যি কাজ নেই। আখড়ায় যে মূর্তি দেখেচি! মাথায় জট পাকানো, গা-ময় রুদ্রাক্ষির মালা, হাতে পেতলের বালা—সে অপরূপ—

কথা শেষ করিতে পারিল না, হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। রাগ করিয়া তুলিয়া সাইয়া দিলাম। অবশেষে বিষম খাইয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া অনেক কষ্টে াসি থামিলে বলিল, বোষ্টুমীরা কি বললে তোমায়? নাক-খাঁদা উল্কিপরা ানেকগুলো সেখানে থাকে যে গো—

আর একটা তেমনি প্রবল হাসির ঝোঁক আসিতেছিল, সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলাম, বার হাসলে ভয়ানক শাস্তি দেবো। কাল চাকরদের সামনে মুখ বার করতে ারবে না।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে সরিয়া বসিল, মুখে বলিল, সে তোমার মতো বীর-পুরুষের াজ নয়। নিজেই লজ্জায় বেরুতে পারবে না। সংসারে তোমার মতো ভীতু ানুষ আর আছে নাকি?

বলিলাম, কিছুই জানো না লক্ষ্মী। তুমি অবজ্ঞা করলে, ভীতু বললে, কিন্তু সখানে একজন বৈষ্ণবী বলতো আমাকে অহংকারী—দাম্ভিক।

কেন তার কি করেছিলে?

কিছুই না। সে আমার নাম দিয়েছিল নতুনগোসাই। বলতো, গোঁসাই, তোমার তো উদাসীন বৈরাগী-মনের চেয়ে দাম্ভিক মন পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

রাজলক্ষ্মীর হাসি থামিল, কহিল, কি বললে সে ?

বললে, এ রকম উদাসীন বৈরাগী-মনের মানুষের চেয়ে দাম্ভিক ব্যক্তি দুনিয়ায় আর খুঁজে মেলে না। অর্থাৎ কিনা আমি দুর্ধর্ষ বীর। ভীতু মোটেই নই।

রাজলক্ষ্মীর মুখ গম্ভীর হইল। পরিহাসে কানও দিল না, কহিল, তোমার উদাসী মনের খবর সে মাগী পেলে কি করে ?

বলিলাম, বৈষ্ণবীদের প্রতি ও-রূপ অশিষ্ট ভাষা অতিশয় আপত্তিকর।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা জানি ; কিন্তু তিনি তোমার নাম দিলেন নতুন গোঁসাই—তাঁর নামটি কি ?

কমললতা। কেউ কেউ রাগ করে কম্‌লিলতাও বলে। বলে, ও যাদু জানে। বলে, ওর কীর্তন-গানে মানুষ পাগল হয়। সে যা চায় তাই দেয়।

তুমি শুনেচো ?

শুনেচি। চমৎকার।

ওর বয়েস কতো ?

বোধ হয় তোমার মতোই হবে। একটু বেশি হতেও পারে।

দেখতে কেমন ?

ভালো। অন্ততঃ মন্দ বলা চলে না। নাক-খাঁদা, উল্কি-পরা যাদের তুমি দেখেচো তাদের দলের নাম। এ ভদ্রঘরের মেয়ে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আমি ওর কথা শুনেই বুঝেচি। যে-কদিন ছিলে তোমাকে যত্ন করত ত ?

বলিলাম, হ্যাঁ। আমার কোন নালিশ নেই।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, তা করুক। যে সাধ্য-সাধনায় তোমাকে পেতে হয়, তাতে ভগবান মেলে। সে বোষ্টমী-বৈরাগীর কাজ নয়। আমি ভয় করতে যাবো কোথাকার কে এক কমললতাকে ? ছি। এই বলিয়া সে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়াও একটা বড় নিঃশ্বাস পড়িল। বোধ হয় একটু বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলাম, এই শব্দে হুঁস হইল। মোটা তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া চিৎ হইয়া তামাক টানিতে লাগিলাম। উপরে কোথায় একটা ছোট মাকড়সা ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাল বুনিতেছিল, উজ্জ্বল গ্যাসের আলোয় ছায়াটা তার মস্ত বড় বীভৎস জন্তুর মতো কড়িকাঠের গায়ে দেখাইতে লাগিল। আলোকের ব্যবধানে ছায়াটাও কত গুণেই না কায়াটাকে অতিক্রম করিয়া যায়।

রাজলক্ষ্মী ফিরিয়া আসিয়া আমারই বালিশের এককোণে কনুয়ের ভর দিয়া ঝুঁকিয়া বসিল। হাত দিয়া দেখিলাম তাহার কপালের চুলগুলা ভিজা। বোধ হয় এইমাত্র চোখে-মুখে জল দিয়া আসিল।

প্রশ্ন করিলাম, লক্ষ্মী, হঠাৎ এ রকম কলকাতায় চলে এলে যে ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, হঠাৎ মোটেই নয়। সেদিন থেকে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই এমন

মন-কেমন করতে লাগলো যে কিছুতেই টিকতে পারলুম না, ভয় হলো বুঝি হার্টফেল করবো—এ জন্মে আর চোখে দেখতে পাবো না, এই বলিয়া সে গুড়্গুড়ির নলটা আমার মুখ হইতে সরাইয়া দূরে ফেলিয়া দিল, বলিল, একটু থামো। ধুঁয়োর জ্বালায় মুখ পর্যন্ত দেখতে পাই নে এমনি অন্ধকার করে তুলেচো!

গুড়্গুড়ির নল গেলো কিন্তু পরিবর্তে তাহার হাতটা রহিল আমার মুঠোর মধ্যে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বঙ্কু আজকাল কি বলে?

রাজলক্ষ্মী একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, বৌমারা ঘরে এলে সব ছেলেই যা বলে তাই।

তার বেশি কিছু নয়?

কিছু নয় তা বলি নে, কিন্তু ও আমাকে কি দুঃখ দেবে? দুঃখ দিতে পারো শুধু তুমি। তোমরা ছাড়া সত্যিকার দুঃখ মেয়েদের আর কেউ দিতে পারে না।

কিন্তু আমি কি দুঃখ তোমাকে কখনো দিয়েচি, লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী অনাবশ্যক আমার কপালটা হাত দিয়া একবার মুছিয়া দিয়া বলিল, কখনো না। বরঞ্চ আমিই তোমাকে আজ পর্যন্ত কত দুঃখই না দিলুম। নিজের সুখের জন্য তোমাকে লোকের চোখে হেয় করলুম, খেয়ালের ওপর তোমার অসম্মান হতে দিলুম—তার শাস্তি এখন তাই দুকুল ভাসিয়ে দিয়ে চলেছে। দেখতে পাচ্ছো ত?

হাসিয়া বলিলাম, কই না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা হলে মন্তর পড়ে কেউ দু'চোখে তোমার ঠুলি পরিয়ে দিয়েচে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, এত পাপ ক'রেও সংসারে এত ভাগ্য আমার মতো কারো কখনো দেখেচো? কিন্তু আমার তাতেও আশা মিটলো না, কোথা থেকে এসে জুটলো ধর্মের বাতিক, আমার হাতের লক্ষ্মীকে আমি পা দিয়ে ঠেলে দিলুম। গঙ্গামাটি থেকে চলে এসেও চৈতন্য হলো না, কাশী থেকে তোমাকে অনাদরে বিদায় দিলুম।

তাহার দুই চোখ জলে টলটল করিতে লাগিল, আমি হাত দিয়া মুছাইয়া দিলে, বলিল, বিষের গাছ নিজের হাতে পুঁতে এইবার তাতে ফল ধরলো। খেতে পারি নে, শুতে পারি নে, চোখের ঘুম গেলো শুকিয়ে, এলোমেলো কত কি ভয় হয় তার মাথা-মুণ্ডু নেই—গুরুদেব তখনো বাড়িতে ছিলেন, তিনি কি একটা কবজ হাতে বেঁধে দিলেন, বললেন, মা, সকাল থেকে এক আসনে তোমাকে দশহাজার ইষ্টনাম জপ করতে হবে। কিন্তু, পারলুম কই? মনের মধ্যে হু হু করে, পুজোয় বসলেই দুচোখ বেয়ে জল গড়াতে থাকে—এমনি সময়ে এলো তোমার চিঠি। এতদিনে রোগ ধরা পড়লো।

কে ধরলে—গুরুদেব? এবার বোধ হয় আর একটা কবজ লিখে দিলেন?

হাঁ গো, দিলেন। বলে দিলেন সেটা তোমার গলায় বেঁধে দিতে।

তাই দিও, তাতে যদি তোমার রোগ সারে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সেই চিঠিখানা নিয়ে আমার দুদিন কাটলো। কোথা দিয়ে যে কাটলো জানি না। রতনকে ডেকে তার হাতে চিঠির জবাব পাঠিয়ে দিলুম। গঙ্গায় স্নান করে অন্নপূর্ণার মন্দিরে দাঁড়িয়ে বললুম, মা, চিঠিখানা সময় থাকতে যেন তাঁর হাতে পড়ে। আমাকে আত্মহত্যা করে না মরতে হয়। আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমাকে এমন করে বেঁধেছিলে কেন বলো ত?

সহসা এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারিলাম না। তারপর বলিলাম, এ তোমাদের মেয়েদেরই সম্ভব। এ আমরা ভাবতেও পারি নে, বুঝতেও পারি নে।

স্বীকার করো?

করি।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় এক মুহূর্ত আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, সত্যিই বিশ্বাস ক'রো। এ আমাদেরই সম্ভব, পুরুষে সত্যিই এ পারে না।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। রাজলক্ষ্মী কহিল, মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখি আমাদের পাটনার লছমন সাউ। আমাকে সে বারাণসী কাপড় বিক্রি করত। বুড়ো আমাকে বড়ো ভালবাসতো, আমাকে বেটী বলে ডাকতো। আশ্চর্য হয়ে বললে, বেটী, আপ ইঁহা? তার কলকাতায় দোকান ছিল জানতুম, বললুম, সাউজী, আমি কলকাতায় যাবো, আমাকে একটা বাড়ি ঠিক ক'রে দিতে পারো?

সে বললে, পারি। বাঙালীপাড়ায় তার নিজেরই একখানা বাড়ি ছিল, সস্তায় কিনেছিলো, বললে, চাও ত বাড়িটা আমি সেই টাকাতেই তোমাকে দিতে পারি। সাউজী ধর্মভীরু লোক, তার উপর আমার বিশ্বাস ছিল, রাজি হয়ে তাকে বাড়িতে ডেকে এনে টাকা দিলুম, সে রসিদ লিখে দিলে। তারই লোকজন এসব জিনিসপত্র কিনে দিয়েছে। ছ-সাতদিন পরেই রতনদের সঙ্গে নিয়ে এখানে চ'লে এলুম, মনে মনে বললুম, মা অন্নপূর্ণা, দয়া তুমি আমাকে করেছো, নইলে এ সুযোগ কখনো ঘটতো না। দেখা তাঁর আমি পাবোই। এই ত দেখা পেলুম।

বলিলাম, আমাকে যে শীঘ্রই বর্মা যেতে হবে লক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী বলিল, বেশ ত, চলো না। সেখানে অভয়া আছেন, দেশময় বুদ্ধদেবের বড় বড় মন্দির আছে—এসব দেখতে পাবো।

কহিলাম, কিন্তু সে বড় নোংরা দেশ লক্ষ্মী, শুচিবায়ুগ্রস্তদের বিচার-আচার থাকে না—সে দেশে তুমি যাবে কি করে?

রাজলক্ষ্মী আমার কানের উপর মুখ রাখিয়া চুপি চুপি কি একটা কথা বলিল, ভালো বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম, আর একটু চেঁচিয়ে বল শুনি।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না।

তারপরে অসাড়ের মতো তেমনি ভাবেই পড়িয়া রহিল। শুধু তাহার উষ্ণ ঘন নিঃশ্বাস আমার গলার উপরে, আমার গালের উপরে আসিয়া পড়িতে লাগিল।

॥ ছয় ॥

ওগো, ওঠো, কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধোও—রতন চা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে।

আমার সাড়া না পাইয়া রাজলক্ষ্মী পুনরায় ডাকিল, বেলা হলো—কত ঘুমোবে?

—পাশ ফিরিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিলাম, ঘুমোতে দিলে কই? এই ত সবে শুয়েছি।

কানে গেল টেবিলের উপর চায়ের বাটিটা রতন ঠক্ করিয়া রাখিয়া দিয়া বোধ হয় লজ্জায় পলায়ন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ছি ছি, কি বেহায়া তুমি। মানুষকে মিথ্যে কি অপ্রতিভ করতেই পারো! নিজে সারারাত কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোলে, বরঞ্চ আমিই জেগে বসে পাখার বাতাস করলুম পাছে গরমে তোমার ঘুম ভেঙে যায়। আবার আমাকেই এই কথা! ওঠো বলছি, নইলে গায়ে জল ঢেলে দেবো।

উঠিয়া বসিলাম! বেলা না হইলেও তখন সকাল হইয়াছে, জানালাগুলি খোলা, সকালের সেই স্নিগ্ধ আলোকে রাজলক্ষ্মীর কি অপরূপ মূর্তিই চোখে পড়িল। তাহার স্নান, পূজা-আহ্নিক সমাপ্ত হইয়াছে, গঙ্গার ঘাটে উড়ে-পাণ্ডার দেওয়া শ্বেত ও রক্ত-চন্দনের তিলক তাহার ললাটে, পরনে নূতন বাণারসী শাড়ি, পূবের জানালা দিয়া এক টুকরা সোনালী রোদ আসিয়া বাঁকা হইয়া তাহার মুখের একধারে পড়িয়াছে, সলজ্জ কৌতুকের চাপা-হাসি তাহার ঠোঁটের কোণে, অথচ কৃত্রিম ক্রোধে আকুঞ্চিত ভ্রূ-দুটির নীচে চঞ্চল চোখের দৃষ্টি যেন উচ্ছল আবেগে ঝলমল করিতেছে—চাহিয়া আজও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, কাল থেকে কি অতো দেখচো বলো ত।

কহিলাম, তুমিই বলো ত কি অতো দেখচি?

রাজলক্ষ্মী আবার একটু হাসিয়া বলিল, বোধ হয় দেখচো এর চেয়ে পুঁটু, দেখতে ভাল কিনা, কমললতা দেখতে ভাল কিনা—না?

বলিলাম না। রূপের দিক দিয়ে কেউ তারা তোমার কাছেও লাগে না, এমনিই বলা যায়। অতো ক'রে দেখতে হয় না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সে যাক্‌গে; কিন্তু গুণে?

গুণে? সে বিষয়ে অবশ্য মতভেদের সম্ভাবনা আছে তা মানতেই হবে।

গুণের মধ্যে ত শুনলুম কেত্তন করতে পারে।

হাঁ, চমৎকার।

চমৎকার—তা বুঝলে কি করে?

বাঃ—তা বুঝিনে ? বিশুদ্ধ তাল, লয়, সুর—

রাজলক্ষ্মী বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, তাল কাকে বলে ?

বলিলাম, তাল কাকে বলে ছেলেবেলায় যা তোমার পিঠে পড়তো। মনে নেই ?

রাজলক্ষ্মী কহিল, নেই আবার ! সে আমার খুব মনে আছে। কাল খামোকা তোমায় ভীতু বলে অপবাদ করেছি বৈ ত নয়, কিন্তু কমললতা শুধু তোমার উদাসী মনের খবরটাই পেয়েছে, তোমার বীরত্বের কাহিনী শোনে নি বুঝি ?

না, আত্মপ্রশংসা আপনি করতে নেই, সে তুমি শুনিয়ো, কিন্তু তার গলা সুন্দর, গান সুন্দর, তাতে সন্দেহ নেই।

আমারও নেই।—বলিয়াই সহসা তাহার দুই চক্ষু প্রচ্ছন্ন কৌতুকে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, হাঁ গা, তোমার সেই গানটি মনে আছে ? সেই যে পাঠশালার ছুটি হ'লে তুমি গাইতে, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতুম—সেই—কোথা গেলি প্রাণের প্রাণ বাপ দুর্যোধন রে-এ-এ-এ-এ—

হাসি চাপিতে সে মুখে আঁচল চাপা দিল, আমিও হাসিয়া ফেলিলাম। রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু বড্ড ভাবের গান। তোমার মুখে শুনলে গোরু-বাছুরের চোখেও জল এসে পড়তো—মানুষ ত কোন ছার।

রতনের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। অনতিবিলম্বে সে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, আবার চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছে মা, তৈরি হতে দেরী হবে না—এই বলিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া চায়ের বাটিটা হাতে তুলিয়া লইল।

রাজলক্ষ্মী আমাকে বলিল, আর দেরী ক'রো না, ওঠো। এবার চা ফেলা গেলে রতন ক্ষেপে যাবে। ওর অপব্যয় সহ্য হয় না। কি বলিস রতন ?

রতন জবাব দিতে জানে। কহিল, আপনার না সইতে পারে মা, কিন্তু বাবুর জন্যে আমার সব সয়।—এই বলিয়া সে বাটিটা লইয়া চলিয়া গেল। তাহার রাগ হইলে রাজলক্ষ্মীকে সে 'আপনি' বলিত, না হইলে 'তুমি' বলিয়া ডাকিত।

রাজলক্ষ্মী বলিল, রতন তোমাকে সত্যিই বড় ভালবাসে !

বলিলাম, আমারও তাই মনে হয়।

হাঁ। কাশী থেকে তুমি চলে এলে ও ঝগড়া করে আমার কাজ ছেড়ে দিলে। রাগ করে বললুম, আমি যে তোর এত করলুম রতন, তার কি এই প্রতিফল ? ও বললে, রতন নেমকহারাম নয় মা। আমিও চললুম বর্মায়, তোমার ঋণ আমি বাবুর সেবা করে শোধ দেবো। তখন হাতে ধরে, ঘাট মেনে তবে ওকে শান্ত করি।

একটু থামিয়া বলিল, তারপরে তোমার বিয়ের নেমন্তন্ন-পত্র এলো।

বাধা দিয়া বলিলাম, মিছে কথা বলো না। তোমার মতামত জানার জন্যে—

এবারও সেও আমাকে বাধা দিল, কহিল হাঁ গো হাঁ, জানি, রাগ করে যদি লিখতুম করো গে—করতে ত ?

না।

না বৈকি। তোমরা সব পারো।

না, সবাই সব কাজ পারে না।

রাজলক্ষ্মী বলিতে লাগিল, কি জানি রতন মনে কি বুঝলে, কেবলি দেখি আমার মুখের পানে চেয়ে তার দুচোখ ছলছল করে আসে। তারপরে, তার হাতে যখন চিঠির জবাব দিলুম ডাকে ফেলতে, সে বললে, মা, এ চিঠি ডাকে ফেলতে পারবো না—আমি নিজে নিয়ে যাবো হাতে করে। বললুম, মিথ্যে কতকগুলো টাকা খরচ করে লাভ কি বাবা? রতন চোখটা হঠাৎ মুছে ফেলে বললে, কি হয়েচে আমি জানি নে মা, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় যেন পদ্মাতীরের তলা ক্ষয়ে গেছে—গাছপালা, বাড়িঘর নিয়ে কখন যে তলিয়ে যাবে তার ঠিকানা নেই! তোমার দয়ায় আমারও আর অভাব নেই মা—এ টাকা তুমি দিলেও আমি নিতে পারবো না, কিন্তু বিশ্বনাথ মুখ তুলে যদি চান, আমার দেশের কুঁড়েতে তোমার দাসীটাকে কিছু প্রসাদ পাঠিয়ে দিও, সে বর্তে যাবে।

বলিলাম, ব্যাটা নাপতে কি সেয়ানা!

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিল। বলিল, কিন্তু আর দেরি করো না, যাও।

দুপুরবেলা আমাকে সে খাওয়াইতে বসিলে বলিলাম, কাল পরনে ছিল আটপৌরে কাপড়, আজ সকাল থেকে বাণারসী শাড়ির সমারোহ কেন বলো ত?

তুমি বলো ত কেন?

আমি জানি নে।

নিশ্চয় জানো। এ কাপড়খানা চিনতে পারো?

তা পারি। বর্মা থেকে আমি কিনে পাঠিয়েছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সেদিন আমি ভেবে রেখেছিলুম, জীবনে সবচেয়ে বড় দিনটিতে এটি পরবো—তাছাড়া কখনো পরবো না।

তাই পরেচো আজ?

হাঁ, তাই পরেচি আজ।

হাসিয়া বলিলাম, কিন্তু সে ত হয়েছে, এখন ছাড়োগে?

সে চুপ করিয়া রহিল। বলিলাম, খবর পেলাম তুমি এখুনি নাকি কালীঘাটে যাবে?

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য হইয়া কহিল—এখুনি? সে কি করে হবে? তোমাকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তবে ছুটি পাবো।

বলিলাম, না, তখনো পাবে না। রতন বলছিলো, তোমার খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, শুধু কাল দুটিখানি খেয়েছিলে, আবার আজ থেকে শুরু হয়েছে উপোবাস। আমি কি স্থির করেচি জানো? এখন থেকে তোমাকে কড়া শাসনে রাখবো, যা খুশি তাই আর করতে পাবে না!

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, তা হলে ত বাঁচি গো মশাই। খাইদাই থাকি, কোন ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না।

কহিলাম, সেইজন্যেই আজ তুমি কালীঘাটে যেতে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি শুধু আজকের দিনটি আমাকে ভিক্ষে দাও, তারপরে আগেকার দিনে নবাব বাদশা'দের যেমন কেনা-বাঁদী থাকতো, তার বেশি তোমার কাছে চাইবো না।

এতো বিনয় কেন বলো ত?

বিনয় ত নয়, সত্যি। আপনার ওজন বুঝে চলি নি, তোমাকে মানি নি, তাই অপরাধের পর অপরাধ করে কেবলই সাহস বেড়ে গেছে। আজ আমার সেই লক্ষ্মীর অধিকার তোমার কাছে আর নেই—নিজের দোষে হারিয়ে বসে আছি।

চাহিয়া দেখিলাম তাহার চোখে জল আসিয়াছে, বলিল, শুধু আজকের দিনটির জন্য হুকুম দাও, আমি মায়ের আরতি দেখে আসি গে।

বলিলাম, না হয় কাল যেয়ো। নিজেই বললে সারারাত জেগে বসে আমার সেবা করেচো—আজ তুমি বড় শ্রান্ত।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না, আমার কোন শ্রান্তি নেই। শুধু আজ বলে নয়, কত অসুখেই দেখেচি রাতের পর রাত জেগেও তোমার সেবায় আমার কষ্ট হয় না। কিসে আমার সমস্ত অবসাদ যেন মুছে দিয়ে যায়। কতদিন হলো ঠাকুরদেবতা ভুলে ছিলুম, কিছুতে মন দিতে পারি নি—লক্ষ্মীটি, আজ আমাকে মানা করো না—আবার হুকুম দাও।

তবে চলো, দুজনে একসঙ্গে যাই।

রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু উল্লাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, তাই চলো। কিন্তু মনে মনে ঠাকুরদেবতাকে তাচ্ছিল্য করবে না ত?

বলিলাম, শপথ করতে পারবো না; বরঞ্চ তোমার পথ চেয়ে আমি মন্দিরের দোরে দাঁড়িয়ে থাকবো। আমার হয়ে দেবতার কাছে তুমি বর চেয়ে নিও।

কি বর চাইবো, বলো?

অন্নের গ্রাস মুখে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন কামনাই খুঁজিয়া পাইলাম না। সে কথা স্বীকার করিয়া প্রশ্ন করিলাম, বলো ত লক্ষ্মী, কি আমার জন্যে তুমি চাইবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাইবো আয়ু, চাইবো স্বাস্থ্য, আর চাইবো আমার ওপর এখন থেকে যেন তুমি কঠিন হতে পারো। প্রশ্রয় দিয়ে আর যেন না আমার তুমি সর্বনাশ করো। করতেই ত বসেছিলে।

লক্ষ্মী, এ হলো তোমার অভিমানের কথা।

অভিমান ত আছেই। তোমার সে চিঠি কখনো কি ভুলতে পারবো।

অধোমুখে নীরব হইয়া রহিলাম।

সে হাত দিয়া আমার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, তা-বলে এ-ও আমার সয়

না ; কিন্তু কঠোর হতে ত তুমি পারবে না, সে তোমার স্বভাব নয়, কিন্তু এ-কাজ আমাকে এখন থেকে নিজেই করতে হবে, অবহেলা করলে চলবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কাজটা কি ? আরও খাড়া উপোস ?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, উপোসে আমার শাস্তি হয় না, বরং অহঙ্কার বাড়ে। ও আমার পথ নয়।

তবে পথটা কি ঠাওরালে ?

ঠাওরাতে পারি নি, খুঁজে বেড়াচ্চি।

আচ্ছা, সত্যিই আমি কখনো কঠিন হতে পারি, এ তোমার বিশ্বাস হয় ?

হয় গো হয়—খুব হয়।

কখ্খনো হয় না—এ তোমার মিছে কথা।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, মিছে কথাই ত, কিন্তু সেই হয়েছে আমার বিপদ, গোঁসাই ; কিন্তু বেশ নামটি বার করেছে তোমার কমললতা। কেবল ওগো হাঁগো করে প্রাণ যায়, এখন থেকে আমিও ডাকবো নতুনগোঁসাই বলে।

স্বচ্ছন্দে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তবু হয়ত, আচমকা কখনো কমললতা বলে ভুল হবে—তাতে স্বস্তিও পাবে। বলো ঠিক কি না ?

হাসিয়া বলিলাম, লক্ষ্মী, স্বভাব কখনো মলেও যায় না। বাদশাহী আমলের কেনা-বাঁদীদের মতো কথাই হচ্ছে বটে! এতক্ষণে তারা তোমাকে জল্লাদের হাতে সঁপে দিতো।

শুনিয়া রাজলক্ষ্মীও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, জল্লাদের হাতে নিজেই ত সঁপে দিয়েছি।

বলিলাম, চিরকাল তুমি এত দুষ্টু যে কোন জল্লাদের সাধ্য নেই তোমাকে শাসন করে।

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে গিয়াই তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল—এ কি! খাওয়া হয়ে এলো যে। দুধ কই ? মাথা খাও, উঠে পড়ো না যেন। বলিতে বলিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, এ, আর সেই কমললতা।

মিনিট-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া পাতের কাছে দুধের বাটি রাখিয়া পাখা হাতে সে বাতাস করিতে বসিল, বলিল, এতকাল মনে হতো, এ নয়—কোথায় যেন আমার পাপ আছে। তাই, গঙ্গামাটিতে মন বসলো না, ফিরে এলুম কাশীধামে। গুরুদেবকে ডাকিয়ে এনে চুল কেটে গয়না খুলে একেবারে তপস্যা জুড়ে দিলুম। ভাবলুম আর ভাবনা নেই, স্বর্গের সোনার সিঁড়ি তৈরী হলো বলে। এক আপদ তুমি—সে-ও বিদায় হলো ; কিন্তু সেদিন থেকে চোখের জল যে কিছুতেই থামে না। ইষ্টমন্ত্র গেলুম ভুলে, ঠাকুরদেবতা করলেন অন্তর্ধান, বুক উঠলো শুকিয়ে ; ভয় হলো, এই যদি ধর্মের সাধনা, তবে এ সব হচ্ছে কি। শেষে পাগল হবো নাকি।

আমি মুখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলাম, বলিলাম, তপস্যার গোড়াতে দেবতারা সব ভয় দেখান। টিকে থাকলে তবে সিদ্ধিলাভ হয়।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সিদ্ধিতে আমার কাজ নেই, সে আমি পেয়েছি।

কোথায় পেলে ?

এখানে। এই বাড়িতে।

অবিশ্বাস্য। প্রমাণ দাও।

প্রমাণ দিতে যাবো তোমার কাছে ? আমার বয়ে গেছে।

কিন্তু ক্রীতদাসীরা এরূপ উক্তি কদাচ করে না।

দ্যাখো, রাগিও না বলচি। একশোবার ক্রীতদাস ক্রীতদাসী করো ত ভালো হবে না।

আচ্ছা, খালাস দিলুম। এখন থেকে তুমি স্বাধীন।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, স্বাধীন যে কতো এবার তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। কাল কথা বইতে বইতে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, আমার গলার ওপর থেকে তোমার হাতখানি সরিয়ে রেখে আমি উঠে বসলুম। হাত দিয়া দেখি ঘামে তোমার কপাল ভিজে—আঁচলে মুছে দিয়ে একখানা পাখা নিয়ে বসলুম, মিটমিটে আলোটা দিলুম উজ্জ্বল করে—তোমার ঘুমন্ত মুখের পানে চেয়ে চোখ আর ফিরুতে পারলুম না। এ যে এত সুন্দর এর আগে কেন চোখে পড়েনি ? এতদিন কাণা হয়ে ছিলুম কি ? ভাবলুম, এ যদি পাপ তবে পুণ্যে আমার কাজ নেই, এ যদি অধর্ম তবে থাক্ গে আমার ধর্মচর্চা—জীবনে এই যদি হয় মিথ্যে তবে জ্ঞান না হতেই বরণ করেছিলুম একে কার কথায় ? ও কি, খাচ্চো না যে ? সব দুধই পড়ে রইলো যে।

আর পারি নে।

তবে কিছু ফল নিয়ে আসি ?

না, তাও না !

কিন্তু বড় রোগা হয়ে গেছ যে।

যদি হয়ে থাকি সে অনেকদিনের অবহেলায়। একদিনে সংশোধন করতে চাইলেই মারা যাবো।

বেদনায় মুখ তাহার পাংশু হইয়া উঠিল, কহিল, আর হবে না। যে শাস্তি পেলুম সে আর ভুলবো না। এই আমার মস্ত লাভ। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, ভোর হলে উঠে এলুম। ভাগ্যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গে না, নইলে লোভের বশে তোমাকে জাগিয়ে ফেলেছিলুম আর কি। তারপর দরওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা নাইতে গেলুম—মা যেন সব তাপ মুছে নিলেন। বাড়ি এসে আহ্নিকে বসলুম, দেখতে পেলুম তুমি কেবল একাই ফিরে আসো নি, সঙ্গে ফিরে এসেছে আমার পুজোর মন্ত্র। এসেছেন আমার ইষ্টদেবতা, গুরুদেব—এসেছে আমার শ্রাবণের মেঘ। আজও চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো, কিন্তু সে আমার বুকের রক্ত-নেঙড়ানো অশ্রু নয়, আমার আনন্দের উপচে-ওঠা ঝর্ণার ধারা—আমার সকল দিক ভিজিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে

দিয়ে বয়ে গেল। আনি গে দুটো ফল? বঁটি নিয়ে কাছে বসে নিজের হাতে বানিয়ে অনেকদিন তোমায় খেতে দিই নি—যাই? কেমন?

যাও।

রাজলক্ষ্মী তেমনই দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

আমার আবার নিঃশ্বাস পড়িল। এ আর সেই কমললতা!

কি জানি কে উহার জন্মকালে সহস্র নামের মধ্যে বাছিয়া তাহার রাজলক্ষ্মী নাম দিয়াছিল!

দুজনে কালীঘাট হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত্রি ন'টা। রাজলক্ষ্মী স্নান করিয়া, কাপড় ছাড়িয়া সহজ মানুষের মতো কাছে আসিয়া বসিল। বলিলাম, রাজপোষাক গেছে—বাঁচলাম।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ও আমার রাজপোষাকই বটে, কিন্তু রাজার দেওয়া যে? যখন মরবো ঐ কাপড়খানা আমাকে পরিয়ে দিতে বলো।

তাই হবে; কিন্তু সারাদিন ধরে আজ কি তুমি শুধু স্বপ্ন দেখেই কাটাবে? এইবার কিছু খাও।

খাই।

রতনকে বলে দিই ঠাকুর এইখানে তোমার খাবার দিয়ে যাক।

এইখানে? বেশ যা হোক। তোমার সামনে বসে আমি খাবো কেন?—কখনো দেখেচো খেতে?

দেখি নি, কিন্তু দেখলে দোষ কি?

তা কি হয়। মেয়েদের রাক্ষুসে খাওয়া তোমাদের আমরা দেখতেই বা দেবো কেন?

ও ফন্দি আজ খাটবে না, লক্ষ্মী। তোমাকে অকারণ উপোস করতে আমি কিছুতেই দেবো না। না খেলে তোমার সঙ্গে আমি কথা কবো না।

নাই বা কইলে।

আমিও খাবো না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, এইবার জিতেছো। এ আমার সইবে না।

ঠাকুর খাবার দিয়া গেল, ফল-মূল মিষ্টান্ন। সে নামমাত্র আহার করিয়া বলিল, রতন তোমাকে নালিশ জানিয়েছে আমি খাই নে, কিন্তু কি করে খাবো বলো ত? কলকাতায় এসেছিলুম হারা-মোকদ্দমার আপিল করতে। তোমার বাসা থেকে প্রত্যহ রতন ফিরে আসতো, আমি ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারতুম না পাছে সে বলে, দেখা হয়েছে, কিন্তু বাবু এলেন না। যে দুর্ব্যবহার করেছি আমার বলবার ত কিছু নেই।

বলবার দরকার ত নেই। তখন বাসায় স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কাঁচপোকা যেমন তেলাপোকা ধরে নিয়ে যায় তেমনি নিয়ে যেতে।

কে তেলাপোকা—তুমি ?

তাইত জানি। এমন নিরীহ জীব সংসারে কে আছে ?

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, অথচ, তোমাকেই মনে মনে আমি যত ভয় করি এমন কাউকে নয়।

এটি পরিহাস ; কিন্তু হেতু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

রাজলক্ষ্মী আবার ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তার হেতু তোমাকে আমি চিনি। আমি জানি মেয়েদের দিকে তোমার সত্যিকার আসক্তি এতটুকু নেই ; যা আছে তা লোক-দেখানো শিষ্টাচার। সংসারে কোনকিছুতেই তোমার লোভ নেই, যথার্থ প্রয়োজনও নেই। তুমি 'না' বললে তোমাকে ফেরাবো কি দিয়ে ?

বলিলাম, একটু ভুল হলো লক্ষ্মী। পৃথিবীর একটি জিনিসে আজও লোভ আছে—সে তুমি। কেবল ঐখানে 'না' বলতে বাধে। ওর বদলে দুনিয়ার সব-কিছু যে ছাড়তে পারে, শ্রীকান্তর এই জানাটাই আজও তুমি জানতে পারো নি।

হাতটা ধুয়ে আসি গে, বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন দিনের ও দিনান্তের সর্ববিধ কাজকর্ম সারিয়া রাজলক্ষ্মী আসিয়া আমার কাছে বসিল। কহিল, কমললতার গল্প শুনবো, বলো।

যতটা জানি সমস্তই বলিলাম, শুধু নিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু বাদ দিলাম, কারণ, ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা।

আগাগোড়া মন দিয়া শুনিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, যতীনের মরণটাই ওকে সব-চেয়ে বেজেছে। ওর দোষেই সে মারা গেল।

ওর দোষ কিসে ?

দোষ বৈকি। কলঙ্ক এড়াতে ওকেই ত কমললতা ডেকেছিলো সকলের আগে আত্মহত্যায় সাহায্য করতে। সেদিন যতীন স্বীকার করতে পারেনি, কিন্তু আর একদিন নিজের কলঙ্ক এড়াতে, তার ঐ পথটাই সকলের আগে চোখে পড়ে গেলো। এমনি হয়, তাই পাপের সহায় হতে কখনো বন্ধুকে ডাকতে নেই—তাতে একের প্রায়শ্চিত্ত পড়ে অপরের ঘাড়ে। ও নিজে বাঁচলো, কিন্তু মলো তার স্নেহের ধন।

যুক্তিটা ভালো বোঝা গেল না, লক্ষ্মী।

তুমি বুঝবে কি করে ? বুঝেছে কমললতা, বুঝেছে তোমার রাজলক্ষ্মী।

ওঃ—এই ?

এই বৈকি ? আমার বাঁচা কতটুকু বলো ত যখন চেয়ে দেখি তোমার পানে ?

কিন্তু কালই যে বললে তোমার মনে সব কালি মুছে গিয়েছে—আর কোন গ্লানি নেই—সে কি তবে মিছে ?

মিছেই ত। কালি মুছবে মলে—তার আগে নয়। মরতেও চেয়েছি, কিন্তু পারি নে কেবল তোমারই জন্যে।

তা জানি ; কিন্তু এ নিয়ে বার বার যদি ব্যথা দাও, আমি এমনি নিরুদ্দেশ হবো ;

কোথাও আর আমাকে খুঁজে পাবে না।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া একেবারে বুকের কাছে ঘেঁষিয়া, বসিল, বলিল, এমন কথা আর কখনো মুখেও এনো না। তুমি সব পারো, তোমার নিষ্ঠুরতা কোথাও বাধা মানে না।

এমন কথা আর বলবে না বলো?

না।

ভাববে না বলো?

তুমি বলো আমাকে ফেলে কখনো যাবে না?

আমি ত কখনো যাই নে লক্ষ্মী, যখনি দূরে গেছি—তুমি শুধু চাও নি বলেই।

সে তোমার লক্ষ্মী নয়—সে আর কেউ।

সেই আর কাউকেই আজও ভয় করি যে।

না, তাকে ভয় করো না, সে রাক্ষুসী মরেছে।—এই বলিয়া সে আমার সেই হাতটাকেই খুব জোর করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবে থাকিয়া হঠাৎ সে অন্য কথা পাড়িল, বলিল, তুমি কি সত্যিই বর্মায় যাবে?

সত্যি যাবো।

কি করবে গিয়ে—চাকরী? কিন্তু আমরা ত দুজন—কতটুকুই বা আমাদের দরকার?

কিন্তু সেটুকুও ত চাই।

সে ভগবান দিয়ে দেবেন; কিন্তু চাকরী করতে তুমি পারবে না, ও তোমার ধাতে পোষাবে না।

না পোষালে চলে আসবো।

আসবেই জানি। শুধু আড়ি করে অতদূরে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দিতে চাও।

কষ্ট না করলেই পারো।

রাজলক্ষ্মী একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করিয়া বলিল, যাও চালাকি ক'রো না।

বলিলাম, চালাকি করি নি, গেলে তোমার সত্যিই কষ্ট হবে।

রাঁধাবাড়া, বাসন-মাজা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, বিছানা-পাতা—

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবে ঝি-চাকরেরা করবে কি?

কোথায় ঝি-চাকর? তার টাকা কৈ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, নাই থাক্; কিন্তু যতই ভয় দেখাও আমি যাবোই।

চলো। শুধু তুমি আর আমি। কাজের তাড়ায় না পাবে ঝগড়া করবার অবসর, না পাবে পুজো-আহ্নিক-উপোস করার ফুরসৎ।

তা হোক গে। কাজকে আমি কি ভয় করি নাকি?

করো না সত্যি, কিন্তু পেরেও উঠবে না। দুদিন বাদেই ফেরবার তাড়া লাগাবে।

তাতেই বা ভয় কিসের ? সঙ্গে করে নিয়ে যাবো, সঙ্গে করে ফিরিয়ে আনবো। রেখে আসতে হবে না ত। এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, সেই ভালো। দাস-দাসী লোকজন কেউ নেই, একটি ছোট বাড়িতে শুধু তুমি আর আমি—যা খেতে দেবো তাই খাবে, যা পরতে দেবো তাই পরবে—না, তুমি দেখো, আমি হয়ত আর আসতেই চাইবো না।

রাজলক্ষ্মী সহসা আমার কোলের উপরে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কি ভাবচো ?

রাজলক্ষ্মী চোখ চাহিয়া একটু হাসিল, বলিল, আমরা কবে যাবো ?

বলিলাম, এই বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করে নাও, তারপরে যেদিন ইচ্ছে, চলো যাত্রা করি।

সে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া আবার চোখ বুজিল।

আবার কি ভাবচো ?

রাজলক্ষ্মী চাহিয়া বলিল, ভাবচি একবার মুরারিপুরে যাবে না ?

বলিলাম, বিদেশ যাবার পূর্বে একবার দেখা দিয়ে আসবো, তাঁদের কথা দিয়েছিলাম।

তবে চলো, কালই দুজনে যাই।

তুমি যাবে ?

কেন ভয় কিসের ? তোমাকে ভালবাসে কমললতা আর তাকে ভালোবাসে আমাদের গহরদাদা। এ হয়েছে ভালো।

এ সব কে তোমাকে বললে ?

তুমিই বলেছো।

না, আমি বলি নি।

হাঁ, তুমি বলেছো, শুধু জানো না কখন বলেছো।

শুনিয়া সংকোচে ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, সে যাই হোক, সেখানে যাওয়া তোমার উচিত নয়।

কেন নয় ?

সে বেচারাকে ঠাট্টা করে তুমি অস্থির করে তুলবে।

রাজলক্ষ্মী ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল, কুপিতকণ্ঠে কহিল, এতকালে আমার এই পরিচয় পেয়েছো তুমি ? তোমাকে সে ভালোবাসে এই নিয়ে তাকে লজ্জা দিতে যাবো আমি ? তোমাকে ভালবাসাটা কি অপরাধ ? আমিও ত মেয়েমানুষ। হয়ত বা তাকে আমিও ভালোবেসে আসবো।

কিছুই তোমার অসম্ভব নয় লক্ষ্মী—চলো যাই।

হাঁ চলো, কাল সকালের গাড়িতেই বেরিয়ে পড়বো দুজনে—তোমার কোন ভাবনা নেই—এ জীবনে তোমাকে অসুখী করবো না আমি কখনো।

বলিয়াই সে কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া পড়িল। চক্ষু নিমীলিত, শ্বাস-প্রশ্বাস থামিয়া আসিতেছে—সহসা সে যেন কোথায় কতদূরেই না সরিয়া গেল।

ভয় পাইয়া একটা নাড়া দিয়া বলিলাম,ও কি?

রাজলক্ষ্মী চোখ মেলিয়া চাহিল, একটু হাসিয়া কহিল, কৈ না—কিছু ত নয়!

তাহার এই হাসিটাও আজ যেন আমার কেমনধারা লাগিল।

।। সাত ।।

পরদিন আমার অনিচ্ছায় যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না; কিন্তু পরের দিন আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না; মুরারিপুর আখড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেই হইল। রাজলক্ষ্মীর বাহন রতন, সে নহিলে কোথাও পা বাড়ানো চলে না, কিন্তু রান্নাঘরের দাসী লালুর মাও সঙ্গে চলিল। কতক জিনিসপত্র লইয়া রতন ভোরের গাড়ীতে রওনা হইয়া গিয়াছে, সেখানকার ষ্টেশনে নামিয়া সে খান-দুই ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিবে। আবার আমাদের সঙ্গেও মোটঘাট যাহা বাঁধা হইয়াছে, তাহাও কম নয়।

প্রশ্ন করিলাম, সেখানে বসবাস করতে চললে নাকি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, দু-একদিন থাকবো না? দেশের বনজঙ্গল, নদীনালা, মাঠঘাট তুমিই একলা দেখে আসবে, আর আমি কি সে-দেশের মেয়ে নই? আমার দেখতে সাধ যায় না?

তা যায় মানি, কিন্তু এত জিনিসপত্র, এত রকমের খাবার-দাবার আয়োজন—

রাজলক্ষ্মী বলিল, ঠাকুরের স্থানে কি শুধু হাতে যেতে বলো? আর তোমাকে ত বইতে হবে না, তোমার ভাবনা কিসের?

ভাবনা যে কত ছিল সে আর বলিব কাহাকে? আর এই ভয়টাই বেশি ছিল যে বৈষ্ণব-বৈরাগীর ছোঁয়া ঠাকুরের প্রসাদ সে স্বচ্ছন্দে মাথায় তুলিবে কিন্তু মুখে তুলিবে না। কি জানি, সেখানে গিয়া কোন একটা ছলে উপবাস শুরু করিবে, না রাঁধিতে বসিবে বলা কঠিন। কেবল একটা ভরসা ছিল মনটি রাজলক্ষ্মীর সত্যকার ভদ্র মন। অকারণে গায়ে পড়িয়া কাহাকেও ব্যথা দিতে সে পারে না। যদিবা এ-সব কিছু করে, হাসিমুখে রহস্যে-কৌতুকে এমন করিয়াই করিবে যে আমি ও রতন ছাড়া আর কেহ বুঝিতেও পারিবে না।

রাজলক্ষ্মীর দৈহিক ব্যবস্থায় বাহুল্যভার কোনকালেই নাই, তাহাতে সংযম ও উপবাসে সেই দেহটিকে যেন লঘুতার একটি দীপ্তি দান করিয়াছে। বিশেষ করিয়া তাহার আজিকার সাজসজ্জাটি হইয়াছে বিচিত্র। প্রত্যুষে স্নান করিয়া আসিয়াছে, গঙ্গার ঘাটে উড়ে-পাণ্ডার সযত্ন-রচিত অলক-তিলক তাহার ললাটে, পরনে তেমনি নানা ফুলে-ফুলে লতা-পাতায় বিচিত্র খয়ের রঙের বৃন্দাবনী শাড়ি, গায়ে সেই কয়টি অলঙ্কার,

মুখের 'পরে স্নিগ্ধ প্রসন্নতা—আপন মনে কাজে ব্যাপৃত। কাল গোটা-দুই লম্বা আয়না-লাগানো আলমারি কিনিয়া আনিয়াছে, আজ যাইবার পূর্বে তাড়াতাড়ি করিয়া কিসব তাহাতে সে গুছাইয়া তুলিতেছিল। কাজের সঙ্গে হাতের বালার হাঙ্গরের চোখ-দুটা মাঝে মাঝে জ্বলিয়া উঠিতেছে, হীরা ও পান্না বসানো গলার হারের বিভিন্ন বর্ণচ্ছটা পাড়ের ফাঁক দিয়া ঝলকিয়া উঠিতেছে, তাহার কানের কাছেও কি যেন একটা নীলাভ দ্যুতি, টেবিলে চা খাইতে বসিয়া আমি একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়াছিলাম। তাহার একটা দোষ ছিল, বাড়িতে সে জামা অথবা সেমিজ পরিত না। তাই কণ্ঠ ও বাহুর অনেকখানিই হয়ত অসতর্ক মুহূর্তে অনাবৃত হইয়া পড়িত, অথচ বলিলে হাসিয়া কহিত, অত পারিনে বাপু। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, দিনরাত বিবিয়ানা আর সয় না। অর্থাৎ জামা-কাপড়ের বেশি বাঁধাবাঁধি শুচিবায়ুগ্রস্তদের অত্যন্ত অস্বস্তিকর। আলমারির পাল্লা বন্ধ করিয়া হঠাৎ আয়নায় তাহার চোখ পড়িল আমার 'পরে। তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় সামলাইয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল রাগিয়া বলিল, আবার চেয়ে আছ ? এভাবে বারে বারে কি আমাকে এতো দেখো বলো ত ?—বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

আমিও হাসিলাম, বলিলাম, ভাবছিলাম. বিধাতাকে ফরমাশ দিয়ে না জানি কে তোমাকে গড়িয়েছিল।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি। নইলে এমন সৃষ্টিছাড়া পছন্দ আর কার ? আমার পাঁচ-ছ বছর আগে এসেচো, আসবার সময় তাঁকে বায়না দিয়ে এসেছিলে— মনে নেই বুঝি ?

না, কিন্তু তুমি জানলে কি করে ?

চালান দেবার সময় কানে কানে তিনি ব'লে দিয়েছিলেন ; কিন্তু হলো চা খাওয়া ? দেরি করলে আজও যাওয়া হবে না !

নাই বা হলো।

কেন বলো ত ?

সেখানে ভীড়ের মধ্যে হয়ত তোমাকে খুঁজে পাবো না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমাকে পাবে। আমিই তোমাকে খুঁজে পেলে বাঁচি।

বলিলাম, সেও ত ভালো নয়।

সে হাসিয়া কহিল, না সে হবে না। লক্ষ্মীটি, চলো। শুনেচি নতুন গোঁসাইয়ের সেখানে একটা আলাদা ঘর আছে, আমি গিয়েই তার খিলটা ভেঙে রেখে দেবো। ভয় নেই, খুঁজতে হবে না—দাসীকে এমনিই পাবে।

তবে চলো।

আমরা মঠে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন ঠাকুরের মধ্যাহ্নকালীন পূজা সেইমাত্র সমাপ্ত হইয়াছে ; বিনা আহ্বানে, বিনা সংবাদে এতগুলি প্রাণী অকস্মাৎ গিয়া হাজির, তথাপি কি যে তাহারা খুশি হইল বলিতে পারি না। বড়গোঁসাই

আশ্রমে নাই; গুরুদেবকে দেখিতে আবার নবদ্বীপে গিয়াছেন, কিন্তু ইতিমধ্যে জন-দুই বৈরাগী আসিয়া আমারই ঘরে আস্তানা গাড়িয়াছে।

কমললতা, পদ্মা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং আরও অনেকে আসিয়া মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিল; কমললতা গাঢ়স্বরে কহিল, নতুনগোঁসাই, তুমি যে এত শীঘ্র এসে আবার আমাদের দেখা দেবে এ আশা করিনি।

রাজলক্ষ্মী কথা কহিল, যেন কতকালের চেনা; বলিল, কমললতাদিদি, এ ক'দিন শুধু তোমার কথাই ওঁর মুখে, আরও আগে আসতে চেয়েছিলেন, কেবল আমার জন্যই ঘটে ওঠেনি। ওটা আমারি দোষে।

কমললতার মুখ ক্ষণকালের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল, পদ্মা ফিক্ করিয়া হাসিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল।

রাজলক্ষ্মীর বেশভূষা ও চেহারা দেখিয়া সে যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে তাহা সবাই বুঝিয়াছে, শুধু আমার সঙ্গে যে তাহার কি সম্বন্ধ, ইহাই তাহারা নিঃসন্দেহে ধরিতে পারে নাই। পরিচয়ের জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মীর চোখে কিছুই এড়ায় না, বলিল, কমললতাদিদি, আমাকে চিনতে পারচো না?

কমললতা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

বৃন্দাবনে দেখো নি কখনো?

কমললতাও নির্বোধ নয়, পরিহাসটা সে বুঝিল, হাসিয়া বলিল, মনে ত পড়চে না ভাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না পড়াই ভালো দিদি। আমি এ দেশেরই মেয়ে, কখনো বৃন্দাবনের ধারেও যাইনি, বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল, লক্ষ্মী-সরস্বতী ও অন্যান্য সকলে চলিয়া গেলে আমাকে দেখাইয়া কহিল, আমরা দুজনে এক গাঁয়ে এক গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়তুম—দুটিতে যেন ভাই-বোন এমনি ছিল ভাব। পাড়ার সুবাদে দাদা বলে ডাকতুম—বোনের মতো আমাকে কি ভালোই বাসতেন। গায়ে কখনো হাতটি পর্যন্ত দেননি।

আমার পানে চাহিয়া কহিল, হাঁ গা, যা বলচি সব সত্যি নয়?

পদ্মা খুশি হইয়া বলিল, তাই তোমাদের ঠিক এক রকম দেখতে। দুজনেই লম্বা ছিপছিপে—শুধু তুমি ফর্সা আর নতুনগোঁসাই কালো, তোমাদের দেখলেই বোঝা যায়।

রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া বলিল, যাবেই ত ভাই। আমাদের ঠিক এক রকম না হয়ে কি কোন উপায় আছে, পদ্মা?

ও মা? তুমি আমারও নাম জানো যে দেখচি। নতুনগোঁসাই বলেছে বুঝি?

বলেছে বলেই ত তোমাদের দেখতে এলুম। বললুম, সেখানে একলা যাবে কেন, আমাকেও সঙ্গে নাও। তোমার কাছে ত আমার ভয় নেই—একসঙ্গে দেখলে কেউ কলঙ্কও রটাবে না। আর রটালেই বা কি, নীলকণ্ঠের গলাতেই বিষ লেগে থাকবে,

উদরস্থ হবে না।

আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, মেয়েদের এ যে কি রকম ঠাট্টা সে তারাই জানে। রাগিয়া বলিলাম, কেন ছেলেমানুষের সঙ্গে মিথ্যে তামাসা করচ বলো ত?

রাজলক্ষ্মী ভালমানুষের মতো বলিল, সত্যি তামাসাটা কি তুমিই না হয় বলে দাও? যা জানি সরল মনে বলচি, তোমার রাগ কেন?

তাহার গাম্ভীর্য দেখিয়া রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিলাম—সরল মনে বলচি! কমললতা, এত বড় শয়তান, ফাজিল, তুমি সংসারে দুটি খুঁজে পাবে না। এর কি একটা মতলব আছে, কখনো এর কথায় সহজে বিশ্বাস করো না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কেন নিন্দে করো গোঁসাই; তা হলে আমার সম্বন্ধে নিশ্চয় তোমার মনেও কোন মতলব আছে?

আছেই ত।

কিন্তু আমার নেই। আমি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক।

হাঁ, যুধিষ্ঠির!

কমললতাও হাসিল, কিন্তু সে উহার বলার ভঙ্গীতে। বোধ হয়, ঠিক কিছু বুঝিতে পারিল না, শুধু গোলমালে পড়িল। কারণ, সেদিনও আমি ত কোন রমণীর সম্বন্ধেই নিজের কোন আভাস দিই নাই। আর দেবই বা কি করিয়া? দেবার সেদিন ছিলই বা কি?

কমললতা জিজ্ঞাসা করিল, ভাই, তোমার নামটা কি?

আমার নাম রাজলক্ষ্মী। উনি গোড়ার কথাটা ছেড়ে দিয়ে বলেন শুধু লক্ষ্মী। আমি বলি, ওগো, হাঁগো। আজকাল বলচেন নতুনগোঁসাই বলে ডাকতে। বলেন, তবু স্বস্তি পাবো।

পদ্মা হঠাৎ হাততালি দিয়া উঠিল—আমি বুঝেচি।

কমললতা তাহাকে ধমকে দিল—পোড়ারমুখীর ভারি বুদ্ধি। কি বুঝেছিস বলত?

নিশ্চয় বুঝেচি। বলবো?

বলতে হবে না, যা। বলিয়াই সে সস্নেহে রাজলক্ষ্মীর একটা হাত ধরিয়া কহিল, কিন্তু কথায় কথায় বেলা বাড়চে ভাই, রোদ্দুরে মুখখানি শুকিয়ে উঠেচে। খেয়ে কিছু আসো নি জানি—চলো, হাত-পা ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম করবে, তারপরে সবাই মিলে তাঁর প্রসাদ পাবো। তুমিও এসো গোঁসাই। এই বলিয়া সে তাহাকে মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া গেল।

এইবার মনে মনে প্রমাদ গণিলাম। কারণ, এখন আসিবে প্রসাদ গ্রহণের আহ্বান। খাওয়া-ছোঁয়ার বিষয়টা রাজলক্ষ্মীর জীবনে এমন করিয়াই গাঁথা যে এ সম্বন্ধে সত্যা-সত্যের প্রশ্নই অবৈধ। এ শুধু বিশ্বাস নয়—এ তাহার স্বভাব। এ ছাড়া সে বাঁচে না। জীবনের এই একান্ত প্রয়োজনের সহজ ও সক্রিয় সজীবতা কতদিন কত সঙ্কট হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছে সে-কথা কাহারো জানিবার উপায় নাই। নিজে সে

বলিবে না—জানিয়াও লাভ নাই। আমি শুধু জানি যে, রাজলক্ষ্মীকে একদিন না চাহিয়াই দৈবাৎ পাইয়াছি, আজ সে আমার সকল পাওয়ার বড়ো ; কিন্তু সে কথা এখন থাক।

তাহার যত কিছু কঠোরতা সে কেবল নিজেকে লইয়া, অথচ অপরের প্রতি জুলুম ছিল না। বরঞ্চ হাসিয়া বলিত, কাজ কি বাপু অতো কষ্ট করার। একালে অতো বাছতে গেলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না। আমি যে কিছুই মানি না সে জানে। শুধু তাহার চোখের উপর ভয়ংকর একটা কিছু না ঘটিলেই সে খুশি। আমার পরোক্ষ অনাচারের কাহিনীতে কখনো বা সে নিজের দুইকান চাপা দিয়া আত্মরক্ষা করে, কখনো বা গালে হাত দিয়া অবাক হইয়া বলে, আমার অদৃষ্টে কেন তুমি এমন হলে ? তোমাকে নিয়ে আমার যে সব গেল।

কিন্তু আজিকার ব্যাপারটা ঠিক এরূপ নয়। এই নির্জন মঠে যে কয়টি প্রাণী শান্তিতে বাস করে তাহারা দীক্ষিত বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী। ইহাদের জাতিভেদ নাই, পূর্বাশ্রমের কথা ইহারা কেহ মনেও করে না। তাই, অতিথি কেহ আসিলে ঠাকুরের প্রসাদ নিঃসঙ্কোচ-শ্রদ্ধায় বিতরণ করে, এবং প্রত্যাখ্যান করিয়াও আজো কেহ ইহাদের অপমানিত করে নাই ; কিন্তু এই অপ্রীতিকর কার্যই আজ যদি অনাহূত আসিয়া আমাদের দ্বারাই সংঘটিত হয় ত পরিতাপের অবধি রহিবে না। বিশেষ করিয়া আমার নিজের। জানি, কমললতা মুখে কিছুই বলিবে না, কাহাকে বলিতেও দিবে না,—হয়ত বা শুদ্ধমাত্র একটিবার আমার প্রতি চাহিয়াই মাথা নীচু করিয়া অন্যত্র সরিয়া যাইবে। এই নির্বাক্ অভিযোগের জবাব যে কি, এইখানে দাঁড়াইয়া মনে মনে আমি ইহাই ভাবিতেছিলাম। এমনি সময়ে পদ্মা আসিয়া বলিল, এসো নতুনগোঁসাই, দিদিরা তোমাকে ডাকচে। হাত-মুখ ধুয়েছো ?

না।

তবে এসো আমি জল দিই। প্রসাদ দেওয়া হচ্চে।

প্রসাদটা কি হলো আজ ?

আজ হলো ঠাকুরের অন্নভোগ।

মনে মনে বলিলাম, তবে ত সংবাদ আরো ভালো। জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রসাদ কোথায় দিলে ?

পদ্মা বলিল, ঠাকুরঘরের বারান্দায়। বাবাজীমশায়দের সঙ্গে তুমি বসবে, আমরা মেয়েরা খাবো পরে। আজ আমাদের পরিবেশন করবে রাজলক্ষ্মীদিদি, নিজে।

সে খাবে না ?

না। সে ত আমাদের মত বোষ্টম নয়—বামুনের মেয়ে। আমাদের ছোঁয়া খেলে তার পাপ হয়।

তোমার কমললতাদিদি রাগ করবে না ?

রাগ করবে কেন, বরঞ্চ হাসতে লাগলো। রাজলক্ষ্মীদিদিকে বললে, পরজন্মে আমরা দু-বোনে গিয়ে জন্মাবো এক মায়ের পেটে। আমি জন্মাবো আগে, আর তুমি

আসবে পরে। তখন মায়ের হাতে দু-বোনে এক পাতায় বসে খাবো। তখন কিন্তু জাত যাবে বললে মা তোমার কান ম'লে দেবে।

শুনিয়া খুশি হইয়া ভাবিলাম, এইবার ঠিক হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী কখনো কথায় তাহার সমকক্ষ পায় নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জবাব দিলে সে ?

পদ্মা কহিল, রাজলক্ষ্মীদিদিও শুনে হাসতে লাগলো, বললে, মা কেন দিদি, তখন বড় বোন হয়ে তুমিই দেবে আমার কান ম'লে, ছোটর আস্পর্ধা কিছুতেই সইবে না।

প্রত্যুত্তর শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, শুধু প্রার্থনা করিলাম ইহার নিহিত অর্থ কমললতা যেন না বুঝিতে পারিয়া থাকে।

গিয়া দেখিলাম, প্রার্থনা আমার মঞ্জুর হইয়াছে, কমললতা সে কথায় কান দেয় নাই। বরঞ্চ, এই অমিলটুকু মানিয়া লইয়াই ইতিমধ্যে দুজনের ভারি একটি মিল হইয়া গিয়াছে।

বিকালের গাড়িতে বড়গোঁসাই দ্বারিকাদাস ফিরিয়া আসিলেন তাহার সঙ্গে আসিল আরও জনকয়েক বাবাজী। সর্বাঙ্গের ছাপ ছোপের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দেখিয়া সন্দেহ রহিল না যে ইঁহারাও অবহেলার নন। আমাকে দেখিয়া বড়গোঁসাই খুশি হইলেন, কিন্তু পার্ষদগণ'গ্রাহ্য করিল না। না করিবারই কথা, কারণ শুনা গেল ইঁহাদে' একজন নামজাদা কীর্তনীয়া এবং আর একজন মৃদঙ্গের ওস্তাদ।

প্রসাদ পাওয়া সমাপ্ত করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই মরা নদী ও সেই বনবাদাড়। বেনু ও বেতসকুঞ্জ চারিদিকে—গায়ের চামড়া বাঁচানো দায়। আসন্ন সূর্যাস্তকালে তটপ্রান্তে বসিয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিব সংকল্প করিলাম, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বোধ করি কচু-জাতীয় 'আঁধার-মাণিক' ফুল ফুটিয়াছে। তাহার বীভৎস মাংস-পচা গন্ধে তিষ্ঠিতে দিল না। মনে মনে ভাবিলাম, কবিরা ফুল এত ভালবাসেন, কেহ এটাকে লইয়া গিয়া তাঁহাদের উপহার দিয়া আসে না কেন ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রত্যাবর্তন করিলাম। গিয়া দেখি, সেখানে সমারোহ ব্যাপার। ঠাকুর ও ঠাকুরঘর সাজানো হইতেছে, আরতির পরে কীর্তনের বৈঠক বসিবে।

পদ্মা কহিল, নতুনগোঁসাই, কীর্তন শুনিতে তুমি ভালবাসো, আজ মনোহরদাস বাবাজীর গান শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। কি চমৎকার।

বস্তুতঃ বৈষ্ণব-কবিদের পদাবলীর মত মধুর বস্তু আমার আর নাই, বলিলাম, সত্যিই বড় ভালবাসি পদ্মা। ছেলেবেলায় দু-চার ক্রোশের মধ্যে কোথাও কীর্তন হবে শুনলে আমি ছুটে যেতাম, কিছুতে ঘরে থাকতে পারতাম না। বুঝি-না-বুঝি তবু শেষ পর্যন্ত ব'সে থাকতাম। কমললতা তুমি গাইবে না আজ ?

কমললতা বলিল, না গোঁসাই, আজ না। আমার ত তেমন শিক্ষা নেই, ওঁদের সামনে গাইতে লজ্জা করে। তাছাড়া সেই অসুখটা থেকে গলা তেমনই ধরে আছে, এখনও সারে নি।

বলিলাম, লক্ষ্মী কিন্তু তোমার গান শুনতেই এসেছে।' ও ভাবে আমি বুঝি

বাড়িয়ে বলেছি।

কমললতা সলজ্জে কহিল, বাড়িয়ে নিশ্চয়ই বলেছো গোঁসাই। তারপরে স্মিতমুখে রাজলক্ষ্মীকে বলিল, তুমি কিছু মনে করো না ভাই, সামান্য যা জানি তোমাকে আর একদিন শোনাবো।

রাজলক্ষ্মী প্রসন্ন মুখে কহিল, আচ্ছা দিদি, তোমার যেদিন ইচ্ছে হবে আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি নিজে এসে তোমার গান শুনে যাবো। আমাকে বলিল, তুমি কীর্তন শুনতে এত ভালবাসো, কই, আমাকে ত সে কথা কখনো বলোনি।

উত্তর দিলাম, কেন বলবো তোমাকে? গঙ্গামাটিতে অসুখে যখন শয্যাগত, দুপুরবেলাটা কাটতো শুকনো শূন্য মাঠের পানে চেয়ে, দুর্ভর সন্ধ্যা কিছুতে একলা কাটতে চাইত না—

রাজলক্ষ্মী চট করিয়া আমার মুখে হাত চাপা দিয়া ফেলিল, কহিল, আর যদি বলো পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো। তারপর নিজেই অপ্রতিভ হইয়া হাত সরাইয়া বলিল, কমললতাদিদি, ব'লে এসো ত ভাই তোমাদের বড়গোঁসাইজীকে, আজ বাবাজীমশায়ের কীর্তনের পরে আমি ঠাকুরদের গান শোনাবো।

কমললতা সন্দিগ্ধকণ্ঠে বলিল, কিন্তু বাবাজীরা বড় খুঁতখুঁতে ভাই!

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হোক গে, ভগবানের নাম ত হবে। বিগ্রহমূর্তিগুলিকে হাত দিয়া দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, ওঁরা হয়ত খুশি হবেন, বাবাজীদের জন্যেও ততো ভাবি নে দিদি, কিন্তু আমার এই দুর্বাসা ঠাকুরটি প্রসন্ন হলে বাঁচি।

বলিলাম, হলে কিন্তু বখশিস পাবে।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে বলিল, রক্ষে করো গোঁসাই, সকলের সুমুখে যেন বখশিস দিতে এসো না। তোমার অসাধ্য কাজ নেই।

শুনিয়া বৈষ্ণবীরা হাসিতে লাগিল, পদ্মা খুশি হইলেই হাততালি দেয়, বলিল, আ—মি—বু—ঝে—চি।

কমললতা তাহার প্রতি সস্নেহে চাহিয়া সহাস্যে কহিল—দূর হ পোড়ারমুখী—চুপ কর্। রাজলক্ষ্মীকে কহিল, নিয়ে যাও ত ভাই ওকে, কি জানি হঠাৎ কি একটা বলে বসবে।

ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পরে কীর্তনের আসর বসিল। আজ আলো জ্বলিল অনেকগুলো। মুরারিপুর আখড়া বৈষ্ণব-সমাজে নিতান্ত অখ্যাত নয়, নানা স্থান হইতে কীর্তনীয়া বৈরাগীর দল আসিয়া জুটিলে এরূপ আয়োজন প্রায়ই হয়। মঠে সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র মজুত আছে, দেখিলাম সেগুলো হাজির করা হইয়াছে। একদিকে বসিয়া বৈষ্ণবীগণ—সকলেই পরিচিত, অন্যদিকে উপবিষ্ট অজ্ঞাতকুলশীল অনেকগুলি বৈরাগী-মূর্তি—নানা বয়স ও নানা চেহারার। মাঝখানে সমাসীন বিখ্যাত মনোহরদাস ও তাঁহার মৃদঙ্গবাদক। আমার ঘরের অধুনা দখলিকার একজন ছোকরা বাবাজী দিতেছে হারমোনিয়ামে সুর। এটা প্রচার হইয়াছে যে, কে একজন সম্ভ্রান্ত গৃহের

মহিলা আসিয়াছেন কলিকাতা হইতে—তিনি গাহিবেন গান। তিনি যুবতী, তিনি রূপসী, তিনি বিত্তশালিনী। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে দাস-দাসী, আসিয়াছে বহুবিধ খাদ্যসম্ভার, আর আসিয়াছে কে এক ·নতুনগোঁসাই—সে নাকি এই দেশেরই একজন ভবঘুরে!

মনোহরদাসের কীর্তনের ভূমিকা ও গৌরচন্দ্রিকার মাঝামাঝি এক সময়ে রাজলক্ষ্মী আসিয়া কমললতার কাছে বসিল। হঠাৎ, বাবাজীমশায়ের গলাটা একটু কাঁপিয়াই সামলাইয়া গেল, এবং মৃদঙ্গের বোলটা যে কাটিল না সে নিতান্তই একটা দৈবাতের লীলা। শুধু দ্বারিকাদাস দেয়ালে ঠেস দিয়া যেমন চোখ বুজিয়া ছিলেন তেমনি রহিলেন কি জানি, হয়ত জানিতেই পারিলেন না কে আসিল আর কে আসিল না।

রাজলক্ষ্মী পরিয়া আসিয়াছে একখানা নীলাম্বরী শাড়ী, তাহারি সরু জরির পাড়ের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়াছে গায়ের নীলরঙের জামা। আর সব তেমনি আছে। কেবল সকালের উড়ে পাণ্ডার পরিকল্পিত কপালের ছাপছোপ এবেলা অনেকখানি মুছিয়াছে – অবশিষ্ট যা আছে সে যেন আশ্বিনের ছেঁড়াখোঁড়া মেঘ, নীল আকাশে কখন মিলাইল বলিয়া। অতি শিষ্ট-শান্ত মানুষ আমার প্রতি কটাক্ষেও চাহিল না-- যেন চেনেই না। তবু যে কেন একটুখানি হাসি চাপিয়া লইল, সে সেই জানে। কিংবা আমারও ভুল হইতে পারে—অসম্ভব নয়।

আজ বাবাজীমশায়ের গান জমিল না; কিন্তু সে তাঁর দোষে নয়, লোকগুলোর অধীরতায়। দ্বারিকাদাস চোখ চাহিয়া রাজলক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দিদি, আমার ঠাকুরদের এবার তুমি কিছু নিবেদন করে শোনাও, শুনে আমরাও ধন্য হই।

রাজলক্ষ্মী সেইদিকে মুখ করিয়া ফিরিয়া বসিল। দ্বারিকাদাস খোলটার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওটায় কোন বাধা জন্মাবে না ত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, না।

শুনিয়া শুধু তিনি নয়, মনোহরদাসও মনে মনে কিছু বিস্ময়বোধ করিলেন। কারণ, সাধারণ মেয়েদের কাছে এতটা বোধ করি তাঁহারা আশা করেন না।

গান শুরু হইল। সঙ্কোচের জড়িমা, অজ্ঞতার দ্বিধা কোথাও নাই—নিঃসংশয়ের কণ্ঠ অবাধ জলস্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিল। এ বিদ্যায় সে সুশিক্ষিতা জানি, এ ছিল তাহার জীবিকা; কিন্তু বাংলার নিজস্ব সঙ্গীতের এই ধারাটাও সে যে এত যত্ন করিয়া আয়ত্ত করিয়াছে তাহা ভাবি নাই। প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব কবিগণের এত বিভিন্ন পদাবলী যে তাহার কণ্ঠস্থ তাহাকে জানিত। শুধু সুরে-তালে-লয়ে নয়, বাক্যের বিশুদ্ধতায়, উচ্চারণের স্পষ্টতায় এবং প্রকাশভঙ্গীর মধুরতায় এই সন্ধ্যায় সে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল তাহা অভাবিত। পাথরের ঠাকুর তাদের সম্মুখে, পিছনে বসিয়া ঠাকুর দুর্বাসা—কাহাকে প্রসন্ন করিতে যে তাহার এই আরাধনা, বলা কঠিন। গঙ্গামাটির অপরাধের এতটুকু স্খলনও যদি ইহাতে হয়, কি জানি এ কথা তাহার মনের মধ্যে আজ ছিল কিনা।

সে গাহিতেছিল—

একে পদ-পঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত, কণ্টকে জর-জর ভেল,
তুয়া দরশন-আশে কিছু নাহি জানলুঁ চিরদুখ অব দূরে গেল।
তোহারি মুরালী যব শ্রবণে প্রবেশল ছোড়নু গৃহ-সুখ আশ,
পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণনু, কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥

বড়গোঁসাইজীর চোখে ধারা বহিতেছিল, তিনি আবেগ ও আনন্দের প্রেরণায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিগ্রহের কণ্ঠ হইতে মল্লিকার মালা তুলিয়া লইয়া রাজলক্ষ্মীর গলায় পরাইয়া দিলেন, বলিলেন, প্রার্থনা করি তোমার সমস্ত অকল্যাণ যেন দূর হয় ভাই।

রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল, তারপরে উঠিয়া আমার কাছে আসিয়া পায়ের ধুলো সকলের সম্মুখে মাথায় লইল, চুপি চুপি বলিল, এ মালা তোলা রইলো, বখশিসের ভয় না দেখালে এখানেই তোমার গলায় পরিয়ে দিতুম।—বলিয়াই চলিয়া গেল।

গানের আসর শেষ হইল। মনে হইল জীবনটা যেন আজ সার্থক হইল।

ক্রমশঃ প্রসাদ বিতরণের আয়োজন আরম্ভ হইল। তাহাকে অন্ধকারে একটু আড়ালে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম, ও মালা রেখে দাও, এখানে নয়, বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমার হাত থেকে পরবো।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এখানে ঠাকুরবাড়িতে পরে ফেললে আর খুলতে পারবে না—এই বুঝি ভয়?

না, ভয় আর নেই, সে ঘুচেছে। সমস্ত পৃথিবী আমার থাকলে তোমাকে আজ তা দান করতাম।

উঃ কি দাতা। সে তোমারি থাকতো গো।

বলিলাম, তোমাকে আজ অসংখ্য ধন্যবাদ।

কেন বলো ত?

বলিলাম, আজ মনে হচ্চে তোমার আমি যোগ্য নই। রূপে, গুণে, রসে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, স্নেহে, সৌজন্যে পরিপূর্ণ যে ধন আমি অযাচিত পেয়েছি, সংসারে তার তুলনা নেই। নিজের অযোগ্যতায় লজ্জা পাই লক্ষ্মী—তোমার কাছে সত্যিই আমি বড় কৃতজ্ঞ।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এবার কিন্তু সত্যিই আমি রাগ করবো।

তা করো। ভাবি এ ঐশ্বর্য আমি রাখবো কোথায়?

কেন, চুরি যাবার ভয় নাকি?

না, সে মানুষ তো চোখে দেখতে পাই নে লক্ষ্মী। চুরি করে তোমাকে ধরে রাখবার মতো এত বড় জায়গাই বা সে বেচারা পাবে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী উত্তর দিল না, হাতটা আমার টানিয়া ক্ষণকাল বুকের কাছে ধরিয়া রাখিল, তারপরে বলিল, এমন করে মুখোমুখি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে

লোকে হাসবে যে। কিন্তু ভাবচি, রাত্রে তোমাকে শুতে দিই কোথায়—জায়গা ত নেই?

না থাক, যেখানে হোক শুয়ে রাত্রিটা কাটবেই।

তা কাটবে, কিন্তু শরীর ত ভালো নয়, অসুখ করতে পারে যে।

তোমার ভাবনা নেই, ওরা ব্যবস্থা একটা করবেই।

রাজলক্ষ্মী চিন্তার সুরে বলিল, দেখচি ত সব, ব্যবস্থা কি করবে জানি নে, কিন্তু ভাবনা নেই আমার, আছে ওদের? এসো। যাহোক দুটি খেয়ে শুয়ে পড়বে।

বাস্তবিক লোকের ভিড়ে শোবার স্থান ছিল না। সে-রাত্রে কোনমতে একটা খোলা বারান্দায় মশারি টাঙাইয়া আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল। রাজলক্ষ্মী খুঁত খুঁত করিতে লাগিল, হয়ত বা রাত্রে মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া গেল, কিন্তু আমার ঘুমের বিঘ্ন ঘটিল না।

পরদিন শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিতে পাইলাম রাশীকৃত ফুল তুলিয়া উভয়ে ফিরিয়া আসিল। আমার পরিবর্তে কমললতা আজ রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গী করিয়াছিল। সেখানে নির্জনে তাহাদের কি কথা হইয়াছে জানি না, কিন্তু আজ তাহাদের মুখ দেখিয়া আমি ভারি তৃপ্তিলাভ করিলাম। যেন কতদিনের বন্ধু দুজনে—তাহারা কত কালের আত্মীয়। কাল উভয়ে একত্রে এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, জাতের বিচার সেখানে প্রতিবন্ধক ঘটায় নাই। একজন অপরের হাতে খায় না এই লইয়া কমললতা আমার কাছে হাসিয়া বলিল, তুমি ভেবো না গোঁসাই, সে বন্দোবস্ত আমাদের হয়ে গেছে। আসচে বারে আমি বড় বোন হয়ে জন্মে ওঁর দুটি কান ভাল ক'রে ম'লে দেবো।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার বদলে আমিও একটা শর্ত করে নিয়েছি গোঁসাই। যদি মরি, ওঁকে বোষ্টুমীগিরিতে ইস্তফা দিয়ে তোমার সেবায় নিযুক্ত হতে হবে। তোমাকে ছেড়ে আমি মুক্তি পাব না সে খুব জানি, তখন ভূত হয়ে দিদির ঘাড়ে চাপবো—সেই সিন্ধবাদের দৈত্যের মতো—কাঁধে বসে সব কাজ ওঁকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়বো।

কমললতা সহাস্যে কহিল, তোমরে মরে কাজ নেই ভাই, তোমাকে কাঁধে নিয়ে আমি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াতে পারবো না।

সকালে চা খাইয়া বাহির হইলাম গহরের খোঁজে। কমললতা আসিয়া বলিল, বেশি দেরি ক'রো না গোঁসাই, আর তাকেও সঙ্গে ক'রে এনো। এদিকে একজন বামুন ধরে এনেছি আজ ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে। যেমন নোংরা তেমনি কুঁড়ে রাজলক্ষ্মী সঙ্গে গেছে তাকে সাহায্য করতে।

বলিলাম, ভালো করো নি। রাজলক্ষ্মীর আজ খাওয়া হবে বটে, কিন্তু তোমার ঠাকুর থাকবে উপবাসী।

কমললতা সভয়ে জিব কাটিয়া বলিল, অমন কথা বলো না গোঁসাই, সে কানে শুনলে এখানে আর জলগ্রহণ করবে না।

হাসিয়া বলিলাম, চব্বিশ ঘণ্টাও কাটে নি কমললতা, কিন্তু তাকে তুমি চিনেছো।

সে-ও হাসিয়া বলিল, হাঁ গোঁসাই, চিনেছি। শত-লক্ষেও এমন মানুষ তুমি একটিও খুঁজে পাবে না ভাই। তুমিই ভাগ্যবান্।

গহরের দেখা মিলিল না, সে বাড়ি নাই। তাহার এক বিধবা মামাতো ভগিনী থাকে সুনাম গ্রামে, নবীন জানাইল সে দেশে কি এক নূতন ব্যাধি আসিয়াছে, লোক মরিতেছে বিস্তর। দরিদ্র আত্মীয়া ছেলেপুলে লইয়া বিপদে পড়িয়াছে, তাই সে গিয়াছে চিকিৎসা করাইতে। আজ দশ-বারোদিন সংবাদ নাই—নবীন ভয়ে সারা হইয়াছে—কিন্তু কোন পথ তাহার চোখে পড়িতেছে না। হঠাৎ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার বাবু বোধ হয় আর বেঁচে নেই। মুখ্য চাষা মানুষ আমি, কখনো গাঁয়ের বার হই নি, কোথায় সে দেশ, কোথা দিয়ে যেতে হয়, জানি নে, নইলে ঘর সংসার সব ভেসে গেলেও নবীন নাকি থাকে এখনো বাড়ি বসে। চক্কোত্তিমশাইকে দিনরাত সাধছি, ঠাকুর দয়া করো, তোমাকে জমি বেচে আমি একশ টাকা দেবো, আমাকে একবার নিয়ে চলো কিন্তু বিট্‌লে বামুন নড়লে না। কিন্তু এও বলে রাখচি বাবু, আমার মনিব যদি মারা যায়, চক্কোত্তিকে ঘরে আগুন দিয়ে আমি পোড়াবো তারপর সেই আগুনে নিজে মরবো আত্মহত্যা করে। অত বড় নেমকহারামকে আমি জ্যান্ত রাখবো না।

তাহাকে সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, জেলার নাম জানো নবীন?

নবীন কহিল কেবল শুনেচি গাঁখানা আছে নাকি নদে জেলার কোন্ একটেরে, ইষ্টিসান থেকে অনেক দূরে যেতে হয় গরুর গাড়িতে। বলিল, চক্কোত্তি জানে, কিন্তু বামুন তাও বলতে চায় না।

নবীন পুরাতন চিঠিপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিল, কিন্তু সে সকল হইতে কোন হদিস্ মিলিল না। কেবল মিলিল এই খবরটা যে, মাস-দুই পূর্বেও বিধবা কন্যার মেয়ের বিয়ে বাবদ চক্রবর্তী শ-দুই টাকা গহরের কাছে আদায় করিয়াছে।

বোকা গহরের অনেক টাকা, সুতরাং অক্ষম দরিদ্রেরা ঠকাইবেই, এ লইয়া ক্ষোভ করা বৃথা, কিন্তু এত বড় শয়তানিও সচরাচর চোখে পড়ে না।

নবীন বলিল, বাবু ম'লেই ওর ভালো—একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে বাঁচে। এক পয়সাও আর শোধ করতে হয় না।

অসম্ভব নয়।

গেলাম দুজনে চক্রবর্তীর গৃহে। এমন বিনয়ী, সদালাপী পরদুঃখ-কাতর ভদ্র-ব্যক্তি সংসারে দুর্লভ; কিন্তু বৃদ্ধ হইয়া স্মৃতিশক্তি তাঁহার এত ক্ষীণ হইয়াছে যে কিছুই তাঁহার মনে পড়িল না, এমন কি জেলার নাম পর্যন্ত না। বহু চেষ্টায় একটা টাইম-টেব্‌ল সংগ্রহ করিয়া উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সমস্ত রেল-ষ্টেশন একে একে পড়িয়া গেলাম কিন্তু ষ্টেশনের আদ্যক্ষর পর্যন্ত তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না। দুঃখ করিয়া বলিলেন, লোকে কত জিনিসপত্র টাকাকড়ি ধার বলে চেয়ে নিয়ে যায় বাবা, মনে

করতে পারি নে, আদায়ও হয় না। মনে মনে বলি, মাথার ওপর ধর্ম আছেন, তিনি এর বিচার করবেন।

নবীন আর সহিতে পারিল না, গর্জন করিয়া উঠিল, হাঁ তিনিই তোমার বিচার করবেন না করেন করব আমি।

চক্রবর্তী স্নেহার্দ্র মধুর কণ্ঠে বলিলেন নবীন মিছে রাগ করিস কেন দাদা, তিন-কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, পারলে কি আর এটুকু করি নে? গহর কি আমার পর? সে যে আমার ছেলের মত রে।

নবীন কহিল, সে-সব আমি জানিনে তোমাকে শেষবারের মতো বলচি, বাবুর কাছে আমাকে নিয়ে যাবে ত চলো, নইলে যেদিন তাঁর মন্দ খবর পাবো সেদিন রইলে তুমি আর আমি।

চক্রবর্তী প্রত্যুত্তরে ললাটে করাঘাত করিয়া শুধু বলিলেন. কপাল নবীন, কপাল! নইলে তুই আমাকে এমন কথা বলিস্!

অতএব. পুনরায় দুজনে ফিরিয়া আসিলাম। বাটির বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি ক্ষণকাল আশা করিলাম অনুতপ্ত চক্রবর্তী যদি এখনো ফিরিয়া ডাকে; কিন্তু কোন সাড়া আসিল না, দ্বারের ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, চক্রবর্তী পোড়া কলিকাটি চালিয়া ফেলিয়া নিবিষ্টচিত্তে তামাক সাজিতে বসিয়াছে।

গহরের সংবাদ পাইবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে আখড়ায় ফিরিয়া আসিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় তিনটা। ঠাকুরঘরের বারান্দায় মেয়েদের ভিড় জমিয়াছে, বাবাজীরা কেহ নাই. সম্ভবতঃ সুপ্রচুর প্রসাদ সেবার পরিশ্রমে নির্জীব হইয়া কোথাও বিশ্রাম করিতেছেন। রাত্রিকালে আর একদফা লড়িতে হইবে, তাহার বল-সঞ্চয়ের প্রয়োজন।

উঁকি মারিয়া দেখিলাম ভিড়ের মাঝখানে বসিয়া এক গণক, পাঁজিপুঁথি, খড়ি, শেলেট, পেন্সিল প্রভৃতি গণনার যাবতীয় উপকরণ তাহার কাছে। আমার প্রতি সর্বাগ্রে চোখ পড়িল পদ্মার, সে চেঁচাইয়া উঠিল, নতুনগোঁসাই এয়েছে!

কমললতা বলিল, তখনি জানি গহর গোঁসাই তোমাকে এমনি ছেড়ে দেবে না, কি খেলে সে—

রাজলক্ষ্মী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল- -থাক্ দিদি ও আর জিজ্ঞাসা ক'রো না।

কমললতা তাহার হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, রোদ্দুরে মুখ শুকিয়ে গেছে, রাজ্যের ধুলোবালি উঠেছে মাথায়--স্নানটান হয়েছে তো?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তেল ছোঁন না, হলেও ত বোঝা যাবে না দিদি।

অবশ্য সর্বপ্রকার চেষ্টাই নবীন করিয়াছে, কিন্তু আমি স্বীকার করি নাই, অস্নাত অভুক্তই ফিরিয়া আসিয়াছি।

রাজলক্ষ্মী মহানন্দে কহিল, গণকঠাকুর আমার হাত দেখে বলেছে আমি রাজরাণী হবো।

কি দিলে ?

পদ্মা বলিয়া দিল—পাঁচ টাকা। রাজলক্ষ্মীদিদির আঁচলে বাঁধা ছিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম, আমাকে দিলে আমি তার চেয়েও ভালো বলতে পারতাম।

গণক উড়িয়া ব্রাহ্মণ, বেশ বাংলা বলতে পারে—বাঙ্গালী বলিলেই হয়—সেও হাসিয়া কহিল, না মশাই, টাকার জন্যে নয়, টাকা আমি অনেক রোজগার করি। সত্যিই এমন ভালো হাত আমি আর দেখি নি। দেখবেন, আমার হাত দেখা কখনো মিথ্যে হবে না।

বলিলাম, ঠাকুর, হাত না দেখে কিছু বলতে পারো কি ?

সে কহিল, পারি। একটা ফুলের নাম করুন।

বলিলাম, শিমুল ফুল।

গণক হাসিয়া কহিল, শিমুল ফুলই সই। আমি এর থেকেই ব'লে দেবো আপনি কি চান। এই বলিয়া সে খড়ি দিয়া মিনিট-দুই আঁক কষিয়া হিসাব করিয়া বলিল, আপনি চান একটা খবর জানতে।

কি খবর ?

সে আমার প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিল, না—মামলা-মোকদ্দমা নয় ; আপনি কোন লোকের খবর পেতে চান।

খবরটা বলতে পারো ঠাকুর ?

পারি। খবর ভালো ; দু-একদিনেই জানতে পারবেন।

শুনিয়া মনে মনে একটু বিস্মিত হইলাম, এবং আমার মুখ দেখিয়া সকলেই তাহা অনুমান করিল।

রাজলক্ষ্মী খুশি হইয়া কহিল, দেখলে ত। আমি বলচি ইনি খুব ভালো গোণেন, কিন্তু তোমরা কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না—হেসে উড়িয়ে দাও।

কমললতা বলিল, অবিশ্বাস কিসের ? নতুনগোঁসাই, দেখাও ত ভাই তোমার হাতটা একবার ঠাকুরকে।

আমি করতল প্রসারিত করিয়া ধরিতে গণক নিজের হাতে লইয়া মিনিট দুই-তিন সযত্নে পর্যবেক্ষণ করিল, হিসাব করিল, তারপরে বলিল, মশায়, আপনার ত দেখি মস্ত ফাঁড়া—

ফাঁড়া ? কবে ?

খুব শীঘ্র। মরণ—বাঁচনের কথা।

চাহিয়া দেখিলাম রাজলক্ষ্মীর মুখে আর রক্ত নাই—ভয়ে সাদা হইয়া গিয়াছে।

গণক আমার হাতটা ছাড়িয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিল, দেখি মা তোমার হাতটা আর একবার—

না। আমার হাত দেখতে হবে না—হয়েছে।

তাহার তীব্র ভাবান্তর অত্যন্ত স্পষ্ট। চতুর গণক তৎক্ষণাৎ বুঝিল হিসাবে তাহার ভুল হয় নাই, বলিল, আমি ত দর্পণ মাত্র মা ; ছায়া যা পড়বে তাই আমার মুখে ফুটবে

—কিন্তু রুষ্ট গ্রহকেও শান্ত করা যায়, তার ক্রিয়া আছে—সামান্য দশ-কুড়ি টাকা খরচের ব্যাপার মাত্র।

তুমি আমাদের কলকাতার বাড়িতে যেতে পারো ?

কেন পারবো না মা, নিয়ে গেলেই পারি।

আচ্ছা।

দেখিলাম তাহার গ্রহের কোপের প্রতি পুরা বিশ্বাস আছে, কিন্তু তাহাকে প্রসন্ন করার সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ।

কমললতা বলিল, চলো গোঁসাই তোমার চা তৈরি করে দিই গে—খাবার সময় হয়েছে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি তৈরি করে আনচি দিদি, তুমি ওঁর বসবার জায়গাটা একটু ঠিক করে দাও গে। রতনকে বলো তামাক দিতে। কাল থেকে তার ছায়া দেখবার জো নেই।

অন্যান্য সকলে গণৎকারকে লইয়া কলরব করিতে লাগিল, আমারা চলিয়া আসিলাম।

দক্ষিণের খোলা বারান্দায় আমার দড়ির খাট, রতন ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া দিল, তামাক দিল, হাত-মুখ ধোওয়ার জল আনিয়া দিল—কাল সকাল হইতে বেচারার খাটুনির বিরাম নাই, অথচ কর্ত্রী বলিলেন তাহার ছায়া পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। ফাঁড়া আমার আসন্ন, কিন্তু রতনকে জিজ্ঞাসা করিলে সে নিশ্চয় বলিত, আজ্ঞে না, ফাঁড়া আপনার নয়—আমার।

কমললতা নীচে বারান্দায় বসিয়া গহরের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, বাজলক্ষ্মী চা লইয়া আসিল, মুখ অত্যন্ত ভারী, সুমুখের টুলে বাটিটা রাখিয়া দিয়া কহিল, দ্যাখো তোমাকে একশোবার বলেচি বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ো না—বিপদ ঘটতে কতক্ষণ ? তোমাকে গলায় কাপড় দিয়ে হাতজোড় করচি, কথাটা আমার শোনো।

এতক্ষণ চা তৈরি করিতে বসিয়া রাজলক্ষ্মী বোধ হয় ইহাই ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল। 'খুব শীঘ্র' অর্থে আর কি হইতে পারে ?

কমললতা আশ্চর্য হইয়া কহিল, বনে-জঙ্গলে গোঁসাই আবার কখন গেলো ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, কখন গেলেন সে কি আমি দেখে রেখেচি দিদি ? আমার কি সংসারে আর কাজ নেই ?

আমি বলিলাম, ও দেখে নি, ওর অনুমান। গণক ব্যাটা আচ্ছা বিপদ ঘটিয়ে গেল।

শুনিয়া রতন আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া একটু দ্রুতপদেই প্রস্থান করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, গণকের দোষটা কি ? সে যা দেখবে তাইত বলবে ? পৃথিবীতে ফাঁড়া বলে কি কথা নেই ? বিপদ আরও কখনো ঘটে না নাকি ?

এ-সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে যাওয়া বৃথা। কমললতাও রাজলক্ষ্মীকে চিনিয়াছে সে চুপ করিয়া রহিল।

চায়ের বাটিটা আমি হাতে করা মাত্র রাজলক্ষ্মী কহিল, অমনি দুটো ফল আর মিষ্টি নিয়ে আসি গে?

বলিলাম না।

না কেন? না ছাড়া হাঁ বলতে কি ভগবান তোমাকে দেন নি। কিন্তু আমার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা অধিকতর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমার চোখ দুটো অতো রাঙা দেখাচ্চে কেন? পচা নদীর জলে নেয়ে আসো নি ত?

না, স্নানই আজ করি নি।

কি খেলে সেখানে?

খাই নি কিছুই। ইচ্ছেও হয় নি।

কি ভাবিয়া কাছে আসিয়া সে আমার কপালের উপর হাত রাখিল, তারপরে জামার ভিতরে আমার বুকের কাছে সেই হাতটা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া বলিল, যা ভেবেছি ঠিক তাই। কমলদিদি, দেখো ত এঁর গা-টা—গরম বোধ হচ্ছে না?

কমললতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিল না, কহিল, হলোই না একটু গরম রাজু—ভয় কি?

সে নামকরণে অত্যন্ত পটু। এই নূতন নামটা আমারও কানে গেল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তার মানে জ্বর যে দিদি!

কমললতা কহিল, তাই যদি হয়েই থাকে তোমরা জলে এসে তো পড়োনি? এসেছো আমাদের কাছে, আমরাই তার ব্যবস্থা করবো ভাই, তোমার কিছু চিন্তা নেই।

নিজের এই অসঙ্গত ব্যাকুলতায় অপরের অবিচলিত শান্ত-কণ্ঠ রাজলক্ষ্মীকে প্রকৃতিস্থ করিল, সে লজ্জা পাইয়া কহিল, তাই বলো দিদি। একে এখানে ডাক্তার-বদ্যি নেই, তাতে বার বার দেখেছি ওঁর কিছু একটা হ'লে সহজে সারে না—ভারি ভোগায়। আবার কোথা থেকে এসে ঐ গোণক্কার পোড়ারমুখো ভয় দেখিয়ে দিলে—

দেখালেই বা!

না ভাই দিদি, আমি দেখেছি কি না, ওদের ভালো কথা ফলে না, কিন্তু মন্দটি ঠিক খেটে যায়।

কমললতা স্মিতহাস্যে কহিল, ভয় নেই রাজু এ ক্ষেত্রে খাটবে না। সকাল থেকে গোঁসাই রোদ্দুরে অনেক ঘোরাঘুরি করেছে, তাতে সময়ে স্নানাহার হয় নি, তাই হয়ত গা একটু তপ্ত হয়েছে—কাল সকালে থাকবে না।

লালুর মা আসিয়া কহিল, মা রান্নাঘরে বামুনঠাকুর তোমাকে ডাকচে।

যাই, বলিয়া সে কমললতার প্রতি একটা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল।

আমার রোগের সম্বন্ধে কমললতার কথাই ফলিল। জ্বরটা ঠিক সকালেই গেল না বটে, কিন্তু দু-একদিনেই সুস্থ হইয়া উঠিলাম; কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের ভিতরের কথাটা কমললতা টের পাইল, এবং আরও একজন বোধ হয় পাইলেন, তিনি বড়গোঁসাইজী নিজে।

যাবার দিন আমাদের আড়ালে ডাকিয়া কমললতা জিজ্ঞাসা করিল, গোঁসাই, তোমাদের বিয়ের বছরটি মনে আছে ভাই ? নিকটেই দেখি একটা থালায় ঠাকুরের প্রসাদী চন্দন ও ফুলের মালা।

প্রশ্নের জবাব দিল রাজলক্ষ্মী, বলিল, উনি ছাই জানেন—জানি আমি।

কমললতা হাসিমুখে কহিল, এ কি-রকম কথা যে একজনের মনে রইলো আর একজনের রইলো না ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, খুব ছোট বয়সে কিনা—তাই। ওঁর তখনো ভালো জ্ঞান হয় নি।

কিন্তু উনিই যে বয়সে বড়ো রে রাজু ?

ইঃ ভারী বড়ো। মোটে পাঁচ-ছ বছরের। আমার বয়স তখন আট-ন বছর, একদিন গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে মনে মনে বললুম, আজ থেকে তুমি হ'লে আমার বর। বর ! বর। এই বলিয়া আমাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, কিন্তু ও-রাক্ষস তক্ষুণি আমার মালা সেইখানে দাঁড়িয়ে খেয়ে ফেললে।

কমললতা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ফুলের মালা খেয়ে ফেললে কি করে ?

আমি বলিলাম, ফুলের মালা নয়- পাকা বঁইচি ফলের মালা। সে যাকে দেবে সে-ই খেয়ে ফেলবে।

কমললতা হাসিতে লাগিল, রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু সেই থেকে শুরু হলো আমার দুর্গতি। ওঁকে ফেললুম হারিয়ে, তার পরের কথা আর জানতে চেয়ো না দিদি—কিন্তু লোকে যা ভাবে তাও না—তরো কত কি-ই না ভাবে ! তারপরে অনেকদিন কেঁদে কেঁদে হাতড়ে বেড়ালুম খুঁজে খুঁজে—তখন ঠাকুরের দয়া হলো—যেমন নিজে দিয়েও হঠাৎ একদিন কেড়ে নিয়েছিলেন, তেমনি অকস্মাৎ আর একদিন হাতে হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।—এং বলিয়া সে উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

কমললতা বলিল, সেই ঠাকুরের মালা চন্দন বড়গোঁসাই দিয়েছেন। পাঠিয়ে, আজ ফিরে যাবার দিনে তোমরা দুজনকে দুজনে পরিয়ে দাও।

বাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, ওঁর ইচ্ছে উনি জানেন, কিন্তু আমাকে ও আদেশ করো না। আমার ছেলেবেলায় সেই রাঙা-মালা আজও চোখ বুজলে ওঁর সেই কিশোর গলায় দুলচে দেখতে পাই। ঠাকুরের দেওয়া আমার সেই মালাই চিরদিন থাক দিদি।

বলিলাম, কিন্তু সে-মালা ত খেয়ে ফেলেছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, হাঁ গো রাক্ষস—এইবার আমাকে সুদ্ধ খাও। এই বলিয়া সে হাসিয়া চন্দনের বাটিতে সব কয়টি আঙুল ডুবাইয়া আমার কপালে ছাপ মারিয়া দিল।

সকলে দ্বারিকাদাসের ঘরে গেলাম দেখা করিতে। তিনি কি একটা গ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত ছিলেন, আদর করিয়া বলিলেন, এসো ভাই, বসো।

রাজলক্ষ্মী মেজেতে বসিয়া বলিল, বসবার যে আর সময় নেই গোঁসাই। অনেক

উপদ্রব করেছি, যাবার আগে তাই নমস্কার জানিয়ে তোমার ক্ষমা-ভিক্ষে করতে এলুম।

গোঁসাই বলিলেন, আমরা বৈরাগী মানুষ, ভিক্ষে নিতেই পারি, দিতে পারবো না ভাই; কিন্তু আবার কবে উপদ্রব করতে আসবে বল ত দিদি? আশ্রমটি যে আজ অন্ধকার হয়ে যাবে।

কমললতা বলিল, সত্যি কথা গোঁসাই—সত্যিই মনে হবে বুঝি আজ কোথাও আলো জ্বলে নি, সব অন্ধকার হয়ে আছে।

বড়গোঁসাই বলিলেন, গানে, আনন্দে, হাসিতে. কৌতুকে এ কয়দিন মনে হচ্ছিল যেন চারিদিকে আমাদের বিদ্যুতের আলো জ্বলচে—এমন আর কখনো দেখি নি। আমাকে বলিলেন, কমললতা তোমার নাম দিয়েছে নতুনগোঁসাই, আর আমি ওর নাম দিলাম আজ আনন্দময়ী।

এইবার তাঁহার উচ্ছ্বাসে আমাকে বাধা দিতে হইল, বলিলাম, বড়গোঁসাই, বিদ্যুতের আলোটাই আমাদের চোখে লাগলো, কিন্তু তার কড়কড় ধ্বনি যাদের দিবারাত্রি কর্ণরন্ধ্রে পশে, তাদের একটু জিজ্ঞাসা করো? আনন্দময়ীর সম্বন্ধে অন্ততঃ রতনের মতামতটা—

রতন পিছনে দাঁড়িয়েছিল, পলায়ন করিল।

রাজলক্ষ্মী বলিল, ওদের কথা তুমি শুনো না গোঁসাই, ওরা দিন-রাত আমায় হিংসে করে। আমার পানে চাহিয়া কহিল, এবার যখন আসবো এই রোগা-পট্‌কা অরসিক লোকটিকে ঘরে তালাবন্ধ করে আসবো—ওঁর জ্বালায় কোথাও গিয়ে যদি আমার স্বস্তি আছে!

বড়গোঁসাই বলিলেন, পারবে না আনন্দময়ী—পারবে না। ফেলে আসতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, নিশ্চয় পারবো। সময়ে সময়ে আমার ইচ্ছে হয় গোঁসাই, যেন আমি শীগ্‌গির মরি।

বড়গোঁসাই বলিলেন, এ ইচ্ছে ত বৃন্দাবনে একদিন তাঁর মুখেও প্রকাশ পেয়েছে ভাই, কিন্তু পারেন নি। হাঁ, আনন্দময়ী, কথাটি তোমার কি মনে নেই? সখি! কারে দিয়ে যাবো, তারা কানু-সেবার কি বা জানে—

বলিতে বলিতে তিনি যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন, কহিলেন, সত্য প্রেমের কতটুকুই বা জানি আমরা? কেবল ছলনায় নিজেদের ভোলাই বৈ ত নয়; কিন্তু তুমি জানতে পেরেছো ভাই। তাই বলি, যেদিন এ-প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করবে আনন্দময়ী—

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী যেন শিহরিয়া উঠিল, ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, এমন আশীর্বাদ ক'রো না গোঁসাই, এমন যেন না কপালে ঘটে। বরঞ্চ আশীর্বাদ করো এমনি হেসে-খেলেই একদিন যেন ওকে রেখে মরতে পারি!

কমললতা কথাটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, বড়গোঁসাই তোমার ভালবাসার কথাটাই বলেছেন রাজু, আর কিছু নয়।

আমিও বুঝিয়াছিলাম অনুক্ষণ অন্য ভাবের ভাবুক দ্বারিকদাস—তাহার চিন্তার ধারাটা সহসা আর এক পথে চলিয়া গিয়াছিল মাত্র।

রাজলক্ষ্মী শুষ্কমুখে বলিল, একে ত এই শরীর, তাতে একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে—একগুঁয়ে লোক, কারও কথা শুনতে চান না—আমি দিনরাত কি ভয়ে ভয়েই যে থাকি দিদি, সে আর জানাবো কাকে?

এইবার মনে মনে আমি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম, যাবার সময়ে কথায় কথায় কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহার ঠিকানা নাই। আমি জানি আমাকে অবহেলায় বিদায় দেওয়ার যে মর্মান্তিক আত্মগ্লানি লইয়া এবার রাজলক্ষ্মী কাশী হইতে আসিয়াছে. সর্বপ্রকার হাস্য-পরিহাসের অন্তরালেও কি একটা অজানা কঠিন দণ্ডের আশঙ্কা তাহার মন হইতে কিছুতে ঘুচিতেছে না। সেইটা শান্ত করার অভিপ্রায়ে হাসিয়া বলিলাম, তুমি যতই কেন না লোকের কাছে আমার রোগাদেহের নিন্দে করো লক্ষ্মী এ দেহের বিনাশ নেই। আগে তুমি না মরলে আমি মরচি নে নিশ্চয়—

কথাটা সে শেষ করিতেও দিল না, খপ্ করিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে ছুঁয়ে এদের সামনে তবে তুমি তিন সত্যি করো—বলো এ কথা কখনো মিথ্যা হবে না! বলিতে বলিতেই উদ্গত অশ্রুতে দুই চক্ষু তাহার উপ্‌চাইয়া উঠিল।

সবাই অবাক হইয়া রহিল। তখন লজ্জায় হাতটা আমার সে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল. ঐ পোড়ামুখো গোণক্কার মিছামিছি আমাকে এমনি ভয় দেখিয়ে রেখেচে যে—

এ কথাটাও সে সম্পূর্ণ করিতে পারিল না, এবং মুখের হাসি ও লজ্জার বাধা সত্ত্বেও ফোঁটা দুই চোখের জল তাহার গালের উপরে গড়াইয়া পড়িল।

আবার একবার সকলের কাছে একে একে বিদায় লওয়া হইল। বড়গোঁসাই কথা দিলেন এবার কলিকাতায় গেলে আমাদের ওখানে তিনি পদার্পণ করিবেন এবং পদ্মা কখনো শহর দেখে নাই, সেও সঙ্গে যাইবে'।

স্টেশনে পৌঁছাইয়া সর্বাগ্রে চোখে পড়িল সেই 'পোড়ারমুখো গণক্কার' লোকটাকে। প্লাটফর্মে কম্বল পাতিয়া বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে, আশপাশে লোকও জুটিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, ও সঙ্গে যাবে নাকি?

রাজলক্ষ্মী সলজ্জ হাসি আব একদিকে চাহিয়া গোপন করিল, কিন্তু মাথা নাড়িয়া জানাইল সেও সঙ্গে যাইবে।

বলিলাম। না, ও যাবে না।

কিন্তু ভালো না হোক, মন্দ কিছু ত হবে না। আসুক না সঙ্গে।

বলিলাম, না। ভালোমন্দ যাই হোক ও আসবে না, ওকে যা দেবার দিয়ে এখান থেকেই বিদায় করো, ওর গ্রহশান্তি করার ক্ষমতা এবং সাধুতা যদি থাকে যেন তোমার চোখের আড়ালেই করে।

তবে তাই বলে দিই, এই বলিয়া সে রতনকে দিয়া তাহাকে ডাকাইতে পাঠাইল।

তাহাকে কি দিল জানি না কিন্তু সে অনেক বার মাথা নাড়িয়া ও অনেক আশীর্বাদ করিয়া সহাস্যমুখে বিদায় গ্রহণ করিল।

অনতিবিলম্বে ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইলে কলিকাতা অভিমুখে আমরাও যাত্রা করিলাম।

॥ আট ॥

রাজলক্ষ্মীর প্রশ্নের উত্তরে আমার অর্থাগমের বৃত্তান্তটা প্রকাশ করিতে হইল। আমাদের বর্মা-অফিসের একজন বড়-দরের সাহেব ঘোড়দৌড়ের খেলায় সর্বস্ব হারাইয়া আমার জমানো টাকা ধার লইয়া ছিলেন। নিজেই সর্ত করিয়াছিলেন শুধু সুদ নয়, সুদিন যদি আসে মুনাফার অর্ধেক দিবেন। এবার কলিকাতায় আসিয়া টাকা চাহিয়া পাঠাইলে তিনি কর্জের চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিয়াছেন। এই আমার সম্বল।

সেটা কত?

আমার পক্ষে অনেক, কিন্তু তোমার কাছে অতিশয় তুচ্ছ।

কত শুনি?

সাত-আট হাজার।

এ আমাকে দিতে হবে।

সভয়ে কহিলাম, সে কি কথা। লক্ষ্মী দানই করেন, হাতও পাতেন নাকি?

রাজলক্ষ্মী সহাস্যে কহিল, লক্ষ্মীর অপব্যয় সয় না। তিনি সন্ন্যাসী ফকিরকে বিশ্বাস করেন না—তারা অযোগ্য বলে। আনো টাকা।

কি করবে?

করবো আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থান। এখন থেকে এই হবে আমার বাঁচবার মূলধন।

কিন্তু এটুকু মূলধনে চলবে কেন? তোমার একপাল দাসীচাকরের পনের দিনের মাইনে দিতেই যে কুলোবে না। এর ওপর আছে গুরুপুরুত, আছে তেত্রিশকোটি দেবদেবতা, আছে বহু বিধবার ভরণপোষণ—তাদের উপায় হবে কি?

তাদের জন্য ভাবনা নেই, তাদের মুখ বন্ধ হবে না। আমার নিজের ভরণপোষণের কথাই ভাবছি বুঝলে?

বলিলাম, বুঝেচি। এখন থেকে কোন একটা ছলনায় আপনাকে ভুলিয়ে রাখতে চাও—এই ত?

রাজলক্ষ্মী বলিল, না তা নয়। সে সব টাকা রইল অন্য কাজের জন্যে, কিন্তু তোমার কাছে হাত পেতে যা নেবো এখন থেকে সেই হবে আমার ভবিষ্যতের পুঁজি। কুলোয় খাবো, না হয় উপোস করবো।

তা হ'লে তোমার অদৃষ্টে তাই আছে।

কি আছে—উপোস? এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, তুমি ভাবচো সামান্য,

কিন্তু সামান্যকেই কি করে বাড়িয়ে বড় ক'রে তুলতে হয়, সে বিদ্যে আমার জানি। একদিন বুঝবে আমার ধনের সম্বন্ধে তোমরা যা সন্দেহ করো তা সত্যি নয়।

এ কথা এতদিন বলো নি কেন?

বলি নি বিশ্বাস করবে না বলে। আমার টাকা তুমি ঘৃণায় ছোঁও না, কিন্তু তোমার বিতৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যায়।

ব্যথিত হইয়া কহিলাম, হঠাৎ এ-সব কথা আজ কেন বলচো লক্ষ্মী?

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ কথা তোমার কাছে আজ হঠাৎ ঠেকবে, কিন্তু এ-যে আমার রাত্রি-দিনের ভাবনা। তুমি কি ভাবো অধর্ম-পথের উপার্জন দিয়ে আমি ঠাকুরদেবতার সেবা করি? সে-অর্থের এক কণা তোমার চিকিৎসায় খরচ করলে তোমাকে কি বাঁচাতে পারতুম? ভগবান আমার কাছে থেকে তোমাকে কেড়ে নিতেন। আমি যে তোমারই, এ কথা সত্যি ব'লে তুমি বিশ্বাস করো কৈ?

বিশ্বাস করি ত।

না, করো না।

তাহার প্রতিবাদের তাৎপর্য বুঝিলাম না। সে বলিতে লাগিল কমললতার সঙ্গে পরিচয় তোমার দুদিনের, তবু তার সমস্ত কাহিনী তুমি মন দিয়ে শুনলে, তোমার কাছে তার সকল বাধা ঘুচলো—সে মুক্ত হয়ে গেল; কিন্তু আমাকে কখনো জিজ্ঞাসা করলে না, কোন কথা কখনো বললে না, লক্ষ্মী, তোমার সব ঘটনা আমাকে খুলে বলো। কেন জিজ্ঞাসা করো নি? করো নি ভয়ে। তুমি বিশ্বাস করো না আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো না আপনাকে।

বলিলাম, তাকেও জিজ্ঞাসা করি নি, জানতেও চাই নি। নিজে সে জোর করে শুনিয়েছে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবু তো শুনেচো। সে পর, তার বৃত্তান্ত শুনতে চাও নি প্রয়োজন নেই বলে। আমাকেও কি তাই বলবে নাকি?

না, তা বলবো না; কিন্তু তুমি কি কমললতার চেলা? সে যা করেচে তোমাকেও তা করতে হবে?

ও কথায় আমি ভুলবো না। আমার সব কথা তোমাকে শুনতে হবে।

এ ত বড় মুস্কিল। আমি চাইনে শুনতে, তবু শুনতেই হবে?

হাঁ, হবে। তোমার ভাবনা, শুনলে হয়ত আমাকে আর ভালোবাসতে পারবে না হয়ত বা আমাকে বিদায় দিতে হবে।

তোমার বিবেচনায় সেটা তুচ্ছ ব্যাপার নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না, সে হবে না—তোমাকে শুনতেই হবে তুমি পুরুষমানুষ, তোমার মনে এটুকু জোর নেই যে, উচিত মনে হ'লে আমাকে দূর হ'লে আমাকে দূর করে দিতে পারো।

এই অক্ষমতা অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া কবুল করিয়া বলিলাম, তুমি যে সকল জোরালো

পুরুষদের উল্লেখ ক'রে আমাকে অপদস্থ করেচো লক্ষ্মী, তাঁরা বীরপুরুষ—নমস্য ব্যক্তি, তাঁদের পদধূলির যোগ্যতা আমার নেই। তোমাকে বিদায় দিয়ে একটা দিনও আমি থাকতে পারবো না, হয়ত তখনি ফিরিয়ে আনতে দৌড়বো এবং তুমি না ফিরলে বসলে আমার দুর্গতির অবধি থাকবে না। অতএব এ-সকল বিষয়ের আলোচনা বন্ধ করো।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তুমি জানো, ছেলেবেলায় মা আমাকে এক মৈথিলী রাজপুত্রের হাতে বিক্রি ক'রে দিয়েছিলেন।

হাঁ, আর এক রাজপুত্রের মুখে খবরটা শুনেছিলাম অনেক কাল পরে। সে ছিল আমার বন্ধু।

রাজলক্ষ্মী বলিল, হাঁ, তোমার বন্ধুরই বন্ধু ছিল সে। একদিন মাকে রাগ ক'রে বিদায় ক'রে দিলুম, তিনি দেশে ফিরে এসে রটালেন আমার মৃত্যু। এ খবর তো শুনেছিলে।

হাঁ, শুনেছিলাম।

শুনে তুমি কি ভাবলে?

ভাবলাম, আহা! লক্ষ্মী ম'রে গেল!

এই? আর কিছু না?

আরও ভাবলাম, কাশীতে ম'রে তবু যা হোক একটা সদ্গতি হলো আহা!

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিল, যাও—মিথ্যে 'আহা! আহা!' ক'রে তোমাকে দুঃখ জানাতে হবে না। তুমি একটা 'আহা ও বলো নি, আমি দিব্যি ক'রে বলতে পারি! কই, আমাকে ছুঁয়ে বল ত?

বলিলাম, এতদিন আগেকার কথা কি ঠিক মনে থাকে? বলেছিলাম ব'লেই যেন মনে পড়চে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, থাক্, কষ্ট ক'রে অতদিনের পুরানো কথা আর মনে ক'রে কাজ নেই, আমি সব জানি। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া বলিল, আর আমি? কেঁদে কেঁদে বিশ্বনাথকে প্রত্যহ জানাতুম, ভগবান, আমার অদৃষ্টে এ তুমি কি করলে! তোমাকে সাক্ষী রেখে যার গলায় মালা দিয়েছিলুম, এ জীবনে তাঁর দেখা কি কখনো পাবো না? এমন অশুচি হয়েই চিরকাল কাটবে? সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও আমার আত্মহত্যা ক'রে মরতে ইচ্ছে করে।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ক্লেশ বোধ হইল, কিন্তু আমার নিষেধ শুনিবে না বুঝিয়া মৌন হইয়া রহিলাম।

এই কথাগুলি সে অন্তরে কতদিন, কতভাবে তোলাপাড়া করিয়াছে, আপন অপরাধে ভারাক্রান্ত মনে নীরবে কত মর্মান্তিক বেদনাই সহ্য করিয়াছে, তবু প্রকাশ পাইতে ভরসা পায় নাই পাছে কি করিতে কি হইয়া যায়। এতদিনে এই শক্তি অর্জন করিয়া আসিয়াছে

সে কমললতার কাছে। বৈষ্ণবী আপন প্রচ্ছন্ন কলুষ অনাবৃত করিয়া মুক্তি পাইয়াছে, রাজলক্ষ্মী নিজেও আজ ভয় ও মিথ্যা মর্যাদার শিকল ছিঁড়িয়া তাহারি মতো সহজ হইয়া দাঁড়াইতে চায়, অদৃষ্টে তাহার যাহাই কেননা ঘটুক। এ বিদ্যা দিয়াছে তাহাকে কমললতা। সংসারের একটিমাত্র মানুষের কাছেও যে এই দর্পিতা নারী হেঁট হইয়া আপন দুঃখের সমাধান ভিক্ষা করিয়াছে, এই কথা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া মনের মধ্যে ভারী একটা তৃপ্তিবোধ করিলাম।

উভয়েই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া রাজলক্ষ্মী সহসা বলিয়া উঠিল, রাজপুত্র হঠাৎ মারা গেলেন, কিন্তু মা আবার চক্রান্ত করলেন আমাকে বিক্রি করবার—

এবার কার কাছে?

অপর একটি রাজপুত্র—তোমার সেই বন্ধু-রত্নটি—যাঁর সঙ্গে শিকার করতে গিয়ে—কি হলো মনে নেই?

বলিলাম, নে-ই বোধ হয়? অনেকদিনের কথা কিনা; কিন্তু তার-পরে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, এ ষড়যন্ত্র খাটলো না। বললুম, মা তুমি বাড়ি যাও। মা বললেন, হাজার টাকা নিয়েছি যে। বললুম, সেই টাকা নিয়ে তুমি দেশে যাও, দালালির টাকা যেমন ক'রে পারি আমি শোধ কবে ক'রে দেবো। বললুম, আজ রাত্রির গাড়িতেই যদি বিদায় না হও মা, কাল সকালেই দেবো আমি আপনাকে আপনি বিক্রি ক'রে মা-গঙ্গার জলে। জান ত মা আমাকে, আমি মিথ্যে ভয় তোমাকে দেখাচ্চি নে। মা বিদায় হলেন। তাঁর মুখেই আমার মরণ-সংবাদ পেয়ে তুমি দুঃখ ক'রে বলেছিলে—আহা ম'রে গেল। এই বলিয়া সে নিজেই একটুখানি হাসিল, বলিল, সত্যি হ'লে তোমার মুখের সেই আহাটুকুই আমার ঢের; কিন্তু এবার যেদিন সত্যি সত্যিই মরবো, যেদিন কিন্তু দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলো। ব'লো পৃথিবীতে অনেক বর-বধূ অনেক মালা বদল করেছে, তাদের প্রেমে জগৎ পবিত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু তোমার কুলটা রাজলক্ষ্মী তার ন'বছর বয়সের সেই কিশোর বরটিকে একমনে যত ভালোবেসেছে, এ সংসারে তত ভালো কেউ কোনদিন কাউকে বাসে নি। আমার কানে কানে তখন বলবে বলো এই কথাগুলো? আমি মরেও শুনতে পাবো।

এ কি, তুমি কাঁদচো যে?

সে চোখের জল আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, সিরুপায় ছেলে-মানুষের ওপর তার আত্মীয়-স্বজন যত অত্যাচার করেছে, অন্তর্যামী ভগবান কি তা দেখতে পান নি ভাবো? এর বিচার তিনি করবেন, না চোখ বুজেই থাকবেন?

বলিলাম, থাকা উচিত নয় ব'লেই মনে করি; কিন্তু তাঁর ব্যাপার তোমরাই ভালো জানো, আমার মতো পাষণ্ডের পরামর্শ তিনি কোন কালেই নেন না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কেবল ঠাট্টা? কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, আচ্ছা, লোকে যে বলে স্ত্রী-পুরুষের ধর্ম এক না হ'লে চলে না, কিন্তু ধর্মে-কর্মে তোমার আমার ত সাপে-নেউলে সম্পর্ক। আমাদের তবে চলে কি ক'রে?

চলে সাপে-নেউলের মতোই। একালে প্রাণে বধ করায় হাঙ্গামা আছে, তাই

একজন আর একজনকে বধ করে না, নির্মম হয়ে বিদায় ক'রে দেয়, যখন আশঙ্কা হয় তার ধর্মসাধনায় বিঘ্ন ঘটছে।

তারপরে কি হয়?

হাসিয়া বলিলাম, তারপরে সে নিজেই কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে। নাকে খত দিয়ে বলে, আমার অনেক শিক্ষা হয়েছে, এ জীবনে এত বড় ভুল আর করবো না, রইল আমার জপ-তপ, গুরু-পুরুত—আমাকে ক্ষমা কর।

রাজলক্ষ্মীও হাসিল, কহিল, ক্ষমা পায় ত?

পায়, কিন্তু তোমার গল্পের কি হলো?

রাজলক্ষ্মী কহিল, বলচি। ক্ষণকাল নিষ্পলক চক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল, মা দেশে চলে গেলেন। আমাকে একজন বুড়ো ওস্তাদ গান-বাজনা শেখাতেন, লোকটি বাঙ্গালী, এককালে সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু ইস্তফা দিয়ে আবার সংসারী হয়েছিলেন। তাঁর ঘরে ছিল মুসলমান স্ত্রী, তিনি শেখাতে আসতেন আমাকে নাচ। তাঁকে বলতুম আমি দাদামশাই,—আমাকে সত্যিই বড় ভালবাসতেন। কেঁদে বললুম, দাদামশাই, আমাকে তুমি রক্ষা করো, এ সব আর আমি পারবো না। তিনি গরীব লোক, হঠাৎ সাহস করলেন না। আমি বললুম, আমার যে টাকা আছে তাতে অনেকদিন চ'লে যাবে। তারপর কপালে যা আছে হবে, এখন কিন্তু পালাই চলো। তারপরে তাঁদের সঙ্গে কত জায়গায় ঘুরলুম—এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর, মথুরা—শেষে আশ্রয় নিলুম এসে পাটনায়। অর্দ্ধেক টাকা জমা দিলুম এক মহাজনের গদীতে, আর অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে ভাগে খুললুম একটা মনোহারী আর একটা কাপড়ের দোকান। বাড়ি কিনে খোঁজ করে বঙ্কুকে আনিয়ে নিয়ে দিলুম তাকে ইস্কুলে ভর্তি করে, আর জীবিকার জন্যে যা করতুম সে ত তুমি নিজের চোখেই দেখেচো।

তাহার কাহিনী শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, তারপরে বলিলাম, তুমি ব'লেই অবিশ্বাস হয় না—আর কেউ হ'লে মনে হতো মিথ্যা বানানো একটা গল্প শুনেছি মাত্র।

রাজলক্ষ্মী কহিল, মিথ্যে বলতে বুঝি আমি পারি নে?

বলিলাম, পারো হয়ত, কিন্তু আমার কাছে আজও বলো নি ব'লেই আমার বিশ্বাস।

এ বিশ্বাস কেন?

কেন? তোমার ভয়, মিথ্যে ছলনায় পাছে কোন দেবতা রুষ্ট হন। তোমাকে শাস্তি দিতে পাছে আমার অকল্যাণ করেন?

আমার মনের কথাই বা জানতে পারো কি করে?

আমি পারি এ আমার দিবানিশির ভাবনা বলে, কিন্তু তোমার ত তা নয়।

হ'লে খুশি হও?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া বলিল, না, হই নে। আমি তোমার দাসী, দাসীকে তার চেয়ে বেশি ভাববে না এই আমি চাই।

উত্তরে বলিলাম সেই সে-যুগের মানুষ তুমি—সেই হাজার বছরের পুরোনো সংস্কার।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তাই যেন আমি হ'তে পারি। এমনি যেন চিরদিন থাকি। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এ যুগের মেয়েদের আমি দেখি নি তুমি ভাবচো? অনেক দেখেচি। বরঞ্চ তুমিই দেখো নি, কিম্বা দেখেছো কেবল বাইরে থেকে। এদের কারুর সঙ্গে আমাকে বদল করো ত দেখি কেমন থাকতে পারো? আমাকে ঠাট্টা করছিলে নাক খত দিয়েছি ব'লে, তখন তুমি দেবে দশ হাত মেপে নাকে খত।

কিন্তু এ মীমাংসা যখন হবার নয়, তখন ঝগড়া ক'রে লাভ নেই। কেবল এইটুকু বলতে পারি, এঁদের সম্বন্ধে তুমি অত্যন্ত অবিচার করেচো।

রাজলক্ষ্মী কহিল, অবিচার যদি করেও থাকি অত্যন্ত অবিচার করি নি তা বলতে পারি। ওগো গোঁসাই, আমিও যে অনেক ঘুরেচি, অনেক দেখেচি। তোমরা যেখানে অন্ধ, সেখানেও যে আমাদের দশ-জোড়া চোখ খোলা।

কিন্তু সে-দেখেচো রঙিন চশমা চোখে দিয়ে, তাই সমস্ত ভুল দেখেচো। দশ জোড়াই ব্যর্থ।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, কি বলবো, আমার হাত-পা বাঁধা, নইলে এমন জব্দ করতুম যে জন্মে ভুলতে না, কিন্তু সে থাক্ গে, আমি সে-যুগের মতো তোমার দাসী হয়েই যেন থাকি, তোমার সেবাই যেন আমার সবচেয়ে বড় কাজ; কিন্তু তোমাকে আমার কথা ভাবতে আমি একটুও দেবো না। সংসারে তোমার অনেক কাজ—এখন থেকে তাই করতে হবে। হতভাগীর জন্যে তোমার অনেক সময় এবং আরও অনেক কিছু গেছে—আর নষ্ট করতে আমি দেবো না।

বলিলাম, এইজন্যেই ত আমি যত শীঘ্র পারি সেই সাবেক চাকরীতে গিয়ে ভর্তি হ'তে চাই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাকরী করতে তোমাকে ত দিতে পারবো না।

কিন্তু মনোহারী দোকান চালাতেও ত আমি পেরে উঠবো না।

কেন পেরে উঠবে না?

প্রথম কারণ, জিনিসের দাম আমার মনে থাকে না, দ্বিতীয় কারণ, দাম নেওয়া এবং দ্রুত হিসেব ক'রে বাকি ফিরিয়ে দেওয়া সে আরও অসম্ভব। দোকান ত উঠবেই, খদ্দেরের সঙ্গে লাঠালাঠি না বাধলে বাঁচি।

তবে একটা কাপড়ের দোকান করো।

তার চেয়ে একটা জ্যান্তবাঘ-ভালুকের দোকান ক'রে দাও, সে বরঞ্চ চালানো সহজ হবে।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, একমনে এত আরাধনা ক'রে কি শেষে ভগবান এমনি একটা অকর্মা মানুষ আমাকে দিলেন যাকে নিয়ে সংসারে এতটুকু কাজ চলে না।

বলিলাম, আরাধনায় ত্রুটি ছিল। সংশোধনের সময় আছে। এখনো কর্মঠ লোক

তোমার মিলতে পারে। বেশ সুপুষ্টু নীরোগ বেঁটে-খাটো জোয়ান, যাকে কেউ হারাতে, কেউ ঠকাতে পারবে না, যাকে কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত, হাতে টাকাকড়ি দিয়ে নির্ভর, যাকে খবরদারি করতে হবে না, ভীড়ের মধ্যে যাকে হারিয়ে ফেলবার উৎকণ্ঠা নেই, যাকে সাজিয়ে তৃপ্তি, খাইয়ে আনন্দ—'হ্যাঁ' ছাড়া যে 'না' বলতে জানে না—

রাজলক্ষ্মী নির্বাক্-মুখে আমার প্রতি চাহিয়াছিল, অকস্মাৎ সর্বাঙ্গে তাহার কাঁটা দিয়া উঠিল, বলিলাম, ও কি ও?

না, কিছু না।

তবে শিউরে উঠলে কেন?

রাজলক্ষ্মী বলিল, মুখে মুখে যে-ছবি তুমি আঁকলে তার অর্দ্ধেক সত্যি হ'লেও বোধ হয় আমি ভয়ে মরে যাই।

কিন্তু আমার মতো এমন অকর্মা লোক নিয়েই বা তুমি করবে কি?

রাজলক্ষ্মী হাসি চাপিয়া বলিল, করবো আর কি। ভগবানকে অভিসম্পাত করবো আর চিরকাল জ্বলে-পুড়ে মরবো। এজন্মে আর ত কিছু চোখে দেখি নে।

এর চেয়ে বরঞ্চ আমাকে মুরারিপুর আখড়ায় পাঠিয়ে দাও না কেন?

তাদেরই বা তুমি কি উপকার করবে?

তাদের ফুল তুলে দেবো। ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যতদিন বেঁচে থাকবো, তারপরে তারা দেবে আমাকে সেই বকুলতলায় সমাধি। ছেলেমানুষ পদ্মা কোন্ সন্ধ্যায় দিয়ে যাবে প্রদীপ জ্বেলে, কখনো বা তার ভুল হবে—সন্ধ্যায় আলো জ্বলবে না। ভোরের ফুল তুলে তারি পাশ দিয়ে ফিরবে যখন কমললতা, কোনদিন বা দেবে সে একমুঠো মল্লিকা ফুল ছড়িয়ে; কোনদিন বা দেবে কুন্দ। আর পরিচিত কেউ যদি কখনো আসে পথ ভুলে, তাকে দেখিয়ে বলবে, ঐখানে থাকে আমাদের নতুনগোঁসাই। ঐ যে একটু উঁচু—ঐ যেখানটায় শুকনো মল্লিকা কুঁদ-করবীর সঙ্গে মিশে ঝরা-বকুলে সব ছেয়ে আছে—ঐখানে।

রাজলক্ষ্মীর চোখ জলে ভরিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, আর সেই পরিচিত লোকটি কি করবে তখন?

বলিলাম, সে আমি জানি নে। হয়ত অনেক টাকা খরচ করে মন্দির বানিয়ে দিয়ে যাবে—

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, হলো না। সে বকুলতলা ছেড়ে আর যাবে না। গাছের ডালে ডালে করবে পাখীরা কলরব, গাইবে গান, করবে লড়াই—কত ঝরিয়ে ফেলবে শুকনো পাতা, শুকনো ডাল, সে-সব মুক্ত করার কাজ থাকবে তার। সকালে লিকিয়ে মুছিয়ে দেবে ফুলের মালা গেঁথে, রাত্রে সবাই ঘুমোলে শোনাবে তাঁকে বৈষ্ণব-কবিদের গান, তারপর সময় হ'লে ডেকে বলবে, কমললতাদিদি, আমাদের এক ক'রে দিয়ো সমাধি, যেন ফাঁক না থাকে, যেন আলাদা ব'লে চেনা না যায়। আর এই নাও টাকা, দিও মন্দির গড়িয়ে, ক'রো রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা, কিন্তু লিখো না

কোন নাম, রেখো না কোন চিহ্ন—কেউ না জানে কে-ই বা এরা, কোথা থেকেই বা এলো।

বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার ছবিটি যে হলো আরও মধুর, আরও সুন্দর।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এ ত কেবল কথা গেঁথে ছবি নয় গোঁসাই, এ যে সত্যি। তফাৎ যে ঐখানে। আমি পারবো, কিন্তু তুমি পারবে না। তোমার আঁকা ছবি শুধু কথা হয়েই থাকবে।

কি ক'রে জানলে?

জানি। তোমার নিজের চেয়েও বেশি জানি। ঐ ত আমার পুজো, ঐ ত আমার ধ্যান। আহ্নিক শেষ ক'রে কার পায়ে দিই জলাঞ্জলি? কার পায়ে দিই ফুল? সে ত তোমারই।

নীচে হইতে মহারাজের ডাক আসিল, মা রতন নেই, চায়ের জল তৈরি হয়ে গেছে।

যাই বাবা, বলিয়া সে চোখ মুছিয়া তখনি উঠিয়া গেল।

খানিক পরে চায়ের বাটি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমার কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল, তুমি বই পড়তে এতো ভালোবাসো, এখন থেকে তাই কেন করো না?

তাতে টাকা ত আসবে না।

কি হবে টাকায়? টাকা ত আমাদের অনেক আছে।

একটু থামিয়া বলিল, উপরের ঐ দক্ষিণের ঘরটা হবে তোমার পড়ার ঘর। আনন্দ-ঠাকুরপো আনবে বই কিনে, আর আমি সাজিয়ে তুলবো আমার মনের মতো ক'রে। ওর একপাশে থাকবে আমার শোবার-ঘর অন্য পাশে হবে আমার ঠাকুর ঘর। এ জন্মে রইলো আমার ত্রিভুবন—এর বাইরে যেন না কখনো দৃষ্টি যায়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার রান্নাঘর? আনন্দ সন্ন্যাসী মানুষ, ওখানে চোখ না দিলে যে তাকে একটা দিনও রাখা যাবে না; কিন্তু তার সন্ধান পেলে কি ক'রে? কবে আসবে সে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, সন্ধান দিয়েছে কুশারীমশাই—আনন্দ আসবে বলচে খুব শীঘ্র। তারপরে সকলে মিলে যাবো গঙ্গামাটিতে—থাকবো সেখানে কিছুদিন।

বলিলাম, তা যেন গেলে, কিন্তু তাদের কাছে গিয়ে এবার তোমার লজ্জা করবে না?

রাজলক্ষ্মী কুণ্ঠিত-হাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু তারা ত কেউ জানে না কাশীতে আমি নাক-চুল কেটে সং সেজেছিলুম? চুল আমার অনেকটা বেড়েছে, আর নাক গেছে বেমালুম জুড়ে। দাগটুকু পর্যন্ত নেই—আর তুমি যে আছ সঙ্গে, আমার সব অন্যায় সব লজ্জা মুছে দিতে।

একটু থামিয়া বলিল, খবর পেয়েছি সেই হতভাগী মালতীটা এসেছে ফিরে, সঙ্গে এনেছে তার স্বামীকে। আমি তাকে দেব একটা হার গড়িয়ে।

বলিলাম, তা, দিয়ো, কিন্তু আবার গিয়ে সুনন্দার পাল্লায় পড়ো—

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না গো না, সে ভয় আর নেই, তার মোহ

আমার কেটেচে, বাপরে বাপ ; এমনি ধর্মবুদ্ধি দিলে যে দিনে রাতে না পারি চোখের জল সামলাতে, না পারি খেতে শুতে। পাগল হয়ে যে যাইনি এই ঢের।—এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, তোমার লক্ষ্মী আর যা-ই হোক, অস্থির মনের লোক নয়। সে সত্যি ব'লে একবার যখন বুঝবে তাকে আর কেউ টলাতে পারবে না। একটুখানি নীরব থাকিয়া পুনশ্চ বলিল, আমার সমস্ত মনটি যেন এখন আনন্দে ডুবে আছে, সব সময়েই মনে হয় এ জীবনের সমস্ত পেয়েছি, আর আমার কিছু চাই নে। এ যদি না ভগবানের নির্দেশ হয় ত আর কি হবে বলো ত? প্রতিদিন পুজো ক'রে ঠাকুরের চরণে নিজের জন্যে আর কিছু কামনা করি নে, কেবল প্রার্থনা করি এমনি আনন্দ যেন সংসারে সবাই পায়। তাইত আনন্দ-ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠিয়েছি তার কাজে এখন থেকে কিছু কিছু সাহায্য করবো ব'লে।

বলিলাম, ক'রো।

রাজলক্ষ্মী নিজের মনে কি ভাবিতে লাগিল, সহসা বলিয়া উঠিল, দ্যাখো, এই সুনন্দা মেয়েটির মতো এমন সৎ, এমন নির্লোভ এমন সত্যবাদী মেয়ে দেখি নি, কিন্তু ওর বিদ্যের ঝাঁঝ যতদিন না মরবে, ততদিন ও বিদ্যে কাজে লাগবে না।

কিন্তু সুনন্দার বিদ্যের দর্প ত নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না ইতরের মতো নেই—আর সে কথাও আমি বলি নি। ও কত শ্লোক, কত শাস্ত্র-কথা, কত গল্প-উপাখ্যান জানে ; ওর মুখে শুনে শুনেই ত আমার ধারণা হয়েছিল আমি তোমার কেউ নই, আমাদের সম্বন্ধ মিথ্যে—আর তাই ত বিশ্বাস করতে চেয়েছিলুম—কিন্তু ভগবান আমাকে ঘাড়ে ধ'রে বুঝিয়ে দিলেন এর চেয়ে মিথ্যে আর নেই। তবে দ্যাখো, ওর বিদ্যের মধ্যে কোথাও মস্ত ভুল আছে। তাই দেখি, কাউকে ও সুখী করতে পারে না, সবাইকে দুঃখ দেয় ; কিন্তু ওর বড় জা ওর চেয়ে অনেক বড়। সাদামাটা মানুষ, লেখাপড়া জানে না, কিন্তু মনের ভেতরটা দয়া-মায়ায় ভরা। কত দুঃখী দরিদ্র পরিবার ও লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতিপালন করে—কেউ জানতে পায় না। ঐ যে তাঁতীদের সঙ্গে একটা সুব্যবস্থা হলো, সে কি সুনন্দাকে দিয়ে কখনো হতো? তেজ দেখিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াতেই হয়েছে ভাবো? কখ্‌খনো না। সে করেছে ওর বড় জা কেঁদে কেটে স্বামীর পায়ে ধরে। সুনন্দা সমস্ত সংসারের কাছে ওর গুরুজন ভাসুরকে চোর ব'লে ছোট ক'রে দিলে—এইটেই কি শাস্ত্র-শিক্ষার বড় কথা? ওর পুঁথির বিদ্যে যতদিন না মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ, পাপ-পুণ্য, লোভ, মোহের সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে নিতে পারবে, ততদিন ওর বইয়ে-পড়া কর্তব্যজ্ঞানের ফল মানুষকে অযথা বিঁধবে, অত্যাচার করবে, সংসারে কাউকে কল্যাণ দেবে না তোমাকে ব'লে দিলুম।

কথাগুলি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, এসব তুমি শিখলে কার কাছে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, কি জানি কার কাছে। হয়ত তোমারি কাছে। তুমি বলো না কিছুই, চাও না কিছুই, জোর করো না কারো ওপর, তাই তোমার কাছে শেখা ত কেবল শেখা নয়, সত্যি ক'রে পাওয়া। হঠাৎ একদিন আশ্চর্য হয়ে ভাবতে

হয় এসব এলো কোথা থেকে। সে যাকগে, এবার গিয়ে কিন্তু বড় কুশারী-গিন্নীর সঙ্গে ভাব করবো, সেবার তাঁকে অবহেলা ক'রে যে ভুল করেছি, এবার তার সংশোধন হবে। যাবে ত গঙ্গামাটিতে?

কিন্তু বর্মা? আমার চাকরী?

আবার চাকরী? এই যে বললুম, চাকরী তোমাকে আমি করতে দেবো না।

লক্ষ্মী, তোমার স্বভাবটি বেশ। তুমি বলো না কিছুই, চাও না কিছুই, জোর করো না কারো ওপর—খাঁটি বৈষ্ণবী-তিতিক্ষার নমুনা শুধু তোমার কাছেই মেলে।

তাই বলে যার যা খেয়াল তাতেই সায় দিতে হবে? সংসারে আর কারও সুখ-দুঃখ নেই নাকি? তুমি নিজেই সব?

ঠিক বটে! কিন্তু অভয়া? সে প্লেগের ভয়ও করে নি, সে দুর্দিনে আশ্রয় দিয়ে না বাঁচালে আজ ত আমাকে তুমি পেতে না। তাদের কি হলো এ কথা একবার ভাববে না?

রাজলক্ষ্মী এক মুহূর্তে করুণা ও কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হইয়া বলিল, তবে তুমি থাকো আনন্দ-ঠাকুরপোকে নিয়ে আমি যাই বর্মায়, গিয়ে তাদের ধ'রে আনিগে। কোন একটা উপায় এখানে হবেই।

বলিলাম, তা হ'তে পারে, কিন্তু সে বড় অভিমানী, আমি না গেলে হয়ত আসবে না।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আসবে। সে বুঝবে যে তুমিই এসেছো তাদের নিতে। দেখো, আমার কথা ভুল হবে না।

কিন্তু আমাকে ফেলে রেখে যেতে পারবে ত?

রাজলক্ষ্মী প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তারপরে অনিশ্চিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, সেই-ই আমার ভয়। হয়ত পারবো না; কিন্তু তার আগে চ'লে না গিয়ে দিনকতক থাকিগে গঙ্গামাটিতে।

সেখানে কি তোমার বিশেষ কোন কাজ আছে?

আছে একটু। কুশারীমশাই খবর পেয়েছেন, পাশের পোড়ামাটি গাঁ-টা তারা বিক্রি করবে। ওটা ভাবচি কিনবো। সে বাড়িটাও ভালো করে তৈরী করাবো, যেন সেখানে থাকতে তোমার কষ্ট না হয়। সেবার দেখেচি ঘরের অভাবে তোমার কষ্ট হতো।

বলিলাম, ঘরের অভাবে কষ্ট হতো না, কষ্ট হতো অন্য কারণে।

রাজলক্ষ্মী ইচ্ছা করিয়াই এ কথায় কান দিল না, বলিল, আমি দেখেচি সেখানে তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকে—বেশিদিন সহরে রাখতে যে তোমাকে ভরসা হয় না, তাই ত তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

কিন্তু এই ভঙ্গুর দেহটাকে নিয়ে যদি অনুক্ষণ তুমি এত বিব্রত থাকো, মনে শান্তি পাবে না লক্ষ্মী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, এ উপদেশ খুব কাজের, কিন্তু আমাকে না নিয়ে নিজে যদি

একটু সাবধানে থাকো, হয়ত সত্যিই শাস্তি একটু পেতে পারি।

শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ এ বিষয়ে তর্ক করা শুধু নিষ্ফল নয়, অপ্রীতিকর। তাহার নিজের স্বাস্থ্য অটুট, কিন্তু সে সৌভাগ্য যাহার নাই, বিনা দোষেও যে তাহার অসুখ করিতে পারে, এ কথা সে কিছুতেই বুঝিবে না। বলিলাম, সহরে আমি কোন কালেই থাকতে চাই নে। সেদিন গঙ্গামাটি আমার ভালোই লেগেছিল, নিজের ইচ্ছেয় চলেও আসি নি—এ কথা আজ তুমি ভুলে গেছো লক্ষ্মী।

না গো না, ভুলি নি। সারা জীবনে ভুলবো না—এই বলিয়া সে একটু হাসিল। বলিল, সেবারে তোমার মনে হতো যেন কোন অচেনা জায়গায় এসে পড়েচো, কিন্তু এবারে গিয়ে দেখো তার আকৃতি-প্রকৃতি এমনি বদলে যাবে যে, তাকে আপনার বলে বুঝতে একটুও গোল হবে না। আর কেবল ঘরবাড়ি থাকবার জায়গাই নয়, এবার গিয়ে আমি বদলাবো নিজেকে, আর সবচেয়ে বদলে ভেঙ্গে গড়ে তুলবো নতুন ক'রে তোমাকে—আমার নতুন গোঁসাইজীকে। কমললতাদিদি আর যেন না দাবী করতে পারে তার পথে-বিপথে বেড়াবার সঙ্গী ব'লে।

বলিলাম, এইসব বুঝি ভেবে ভেবে স্থির করেচো?

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, হাঁ। তোমাকে কি বিনামূল্যে অমনি অমনিই নেবো—তার ঋণ পরিশোধ করবো না? আর আমিও যে তোমার জীবনে সত্যি ক'রে এসেছিলুম, যাবার আগে সেই আসার চিহ্ন রেখে যাবো না? এমনি নিষ্ফলা চলে যাবো? কিছুতেই তা আমি হতে দেবো না।

তাহার মুখের পানে চাহিয়া শ্রদ্ধায় ও স্নেহে অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিলাম, হৃদয়ের বিনিময় নর-নারীর অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা—সংসারে নিত্য নিরন্তর ঘটিয়া চলিয়াছে; বিরাম নাই, বিশেষত্ব নাই, আবার এই দান ও প্রতিগ্রহই ব্যক্তিবিশেষের জীবন অবলম্বন করিয়া কি বিচিত্র বিস্ময় ও সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, মহিমা তাহার যুগে যুগে মানুষের মন অভিষিক্ত করিয়াও ফুরাইতে চাহে না। এই সেই অক্ষয় সম্পদ মানুষকে ইহা বৃহৎ করে, শক্তিমান করে, অভাবিত কল্যাণে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া তোলে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি বঙ্কুর কি করবে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে ত আমাকে আর চায় না। ভাবে এ আপদ দূর হলেই ভালো।

কিন্তু সে যে তোমার নিকট-আত্মীয়—তাকে যে ছেলেবেলায় মানুষ ক'রে তুলেচো?

সেই মানুষ-করার সম্বন্ধই থাকবে, আর কিছু মানবো না। নিকট-আত্মীয় আমার সে নয়।

কেন নয়? অস্বীকার করবে কি ক'রে?

অস্বীকার করবার ইচ্ছে আমারও ছিল না,—এই সে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল, আমার সব কথা তুমিও জানো না। আমার বিয়ের গল্প শুনেছিলে।

শুনেছিলাম লোকের মুখে; কিন্তু তখন ত আমি দেশে ছিলাম না।

না, ছিলে না। এমন দুঃখের ইতিহাস আর নেই, এমন নিষ্ঠুরতাও বোধ হয় নি। বাবা মাকে কখনো নিয়ে যান নি, আমিও কখযো তাঁকে দেখি নি। আমরা দুবোন মামার বাড়িতেই মানুষ। ছেলেবেলায় জ্বরে জ্বরে আমার কি চেহারা ছিল মনে আছে ত।

আছে।

তবে শোনো। বিনাদোষে শাস্তির পরিমাণ শুনলে তোমার মত নিষ্ঠুর লোকেরও দয়া হবে। জ্বরে ভুগি কিন্তু মরণ হয় না। মামা নিজেও নানা অসুখে শয্যাগত, হঠাৎ খবর জুটলো, দত্তদের বামুনঠাকুর আমাদের বর, মামার মতোই স্বভাব-কুলীন। বয়স ষাটের কাছে, আমাদের দু'বোনকেই একসঙ্গে তার হাতে দেওয়া হবে। সবাই বললে, এ সুযোগ হারালে আইবুড়ো নাম আর ওদের খণ্ডাবে না। সে চাইলে একশো, মামা পাইকিরি দর হাঁকলে পঞ্চাশ টাকা। এক আসনে একসঙ্গে—মেহনত কম। সে নাবলো পঁচাত্তরে; বললে, মশাই, দু-দুটো ভাগ্নীকে কুলীনে পার করবেন, একজোড়া রামছাগলের দাম দেবেন না? ভোর রাত্রে লগ্ন, দিদি নাকি জেগে ছিল, কিন্তু আমাকে পুঁটুলি বেঁধে এনে উচ্ছুগ্য ক'রে দিলে। সকাল হতে বাকি পঁচিশ টাকার জন্যে ঝগড়া সুরু হ'লো। মামা বললেন, ধারে কুশণ্ডিকে হোক; সে বললে, সে অতো হাবা নয়, এসব কারবারে ধারধোর চলবে না। সে গা ঢাকা দিলে বোধ হয় ভাবলে মামা খুঁজেপেতে এনে তাকে টাকা দিয়ে কাজটা সম্পূর্ণ করবেন। একদিন যায়, দুদিন যায়, মা কাঁদাকাটা করেন, পাড়ার লোকেরা হাসে, মামা গিয়ে দত্তদের কাছে নালিশ করেন, কিন্তু বর আর এলো না। তাদের গাঁয়ে খোঁজ নেওয়া হলো, সেখানে সে যায় নি। আমাদের দেখিয়ে কেউ বলে আধকপালী, কেউ বলে পোড়াকপালী—দিদি লজ্জায় ঘরের বার হয় না—সেই ঘর থেকে ছ'মাস পরে বা'র করা হলো একেবারে শ্মশানে। আরও ছ'মাস পরে কলক্যতার কোন একটা হোটেল থেকে খবর এলো, বরও সেখানে রাঁধতে রাঁধতে জ্বরে মরেচে। বিয়ে আর পুরো হলো না।

বলিলাম, পঁচিশ টাকা দিয়ে বর কিনলে ঐ রকমই হয়।

রাজলক্ষ্মী বলিল, তবু ত সে আমার ভাগে পঁচিশ টাকা পেয়েছিল, কিন্তু তুমি পেয়েছিলে কি—শুধু একছড়া বঁইচির মালা—তাও কিনতে হয় নি—বন থেকে সংগ্রহ হয়েছিল।

কহিলাম, দাম না থাকলে তাকে অমূল্য বলে। আর একটা মানুষ দেখাও ত, যে যে আমার মতো অমূল্য ধন পেয়েছে?

তুমি বলো ত এ কি তোমার মনের সত্যি কথা?

টের পাও না?

না গো না, পাই নে, সত্যি পাই নে—কিন্তু বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল, কহিল, পাই শুধু তখন যখন তুমি ঘুমোও—তোমার মুখের পানে চেয়ে; কিন্তু সে কথা যাক। আমাদের দু'বোনের মতো শাস্তিভোগ এদেশে কতশত মেয়ের কপালেই

ঘটে। আর কোথাও বোধহয় কুকুর-বেড়ালেরও এমন দুর্গতি করতে মানুষের বুকে বাজে, এই বলিয়া সে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, হয়ত তুমি ভাবছো আমার নালিশটা বাড়াবাড়ি, এমন দৃষ্টান্ত আর ক'টা মেলে? এর উত্তরে যদি বলতুম, একটা হ'লেও সমস্ত দেশের কলঙ্ক তাতেও আমার জবাব হতো, কিন্তু সে আমি বলবো না। আমি বলবো, অনেক হয়। যাবে আমার সঙ্গে সেই সব বিধবাদের কাছে, যাঁদের আমি অল্পস্বল্প সাহায্য করি? তাঁরা সবাই সাক্ষ্য দেবেন, তাঁদেরও হাত-পা বেঁধে আত্মীয়-স্বজনে এমনিই জলে ফেলে দিয়েছিল।

বলিলাম, তাই বুঝি তাদের ওপর এত মায়া?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমারও হতো যদি চোখ চেয়ে আমাদের দুঃখটা দেখতে। এখন থেকে একটি একটি ক'রে আমিই তোমাকে সমস্ত দেখাবো।

আমি দেখবো না, চোখ বুজে থাকবো।

পারবে না। আমার কাজের ভার একদিন ফেলে যাবো আমি তোমার ওপর। সব ভুলবে, কিন্তু সে ভুলতে কখনো পারবে না। এই বলিয়া সে একটুখানি মৌন থাকিয়া অকস্মাৎ নিজের পূর্ব কথার অনুসরণে বলিয়া উঠিল, হবেই ত এমনি অত্যাচার। যে দেশে মেয়ের বিয়ে না হ'লে ধর্ম যায়, জাত যায়, লজ্জায় সমাজে মুখ দেখাতে পারে না— হাবা-বোবা-অন্ধ-আতুর কারও রেহাই নেই—সেখানে একটাকে ফাঁকি দিয়ে লোকে অন্যটাকেই রাখে, এ ছাড়া সে দেশে মানুষের আর কি উপায় আছে বলো ত? সেদিন সবাই মিলে আমাদের বোন দুটিকে যদি বলি না দিত, দিদি হয়তো মরতো না, আর আমি—এ জন্মে এমন ক'রে তোমাকে হয়ত পেতুম না, কিন্তু মনের মধ্যে তুমিই চিরদিন এমনি প্রভু হয়েই থাকতে। আর, তাই বা কেন আমাকে এড়াতে তুমি পারতে না, যেখানে হোক, যতদিন হোক নিজে এসে আমাকে নিয়ে যেতে হতোই।

একটা জবাব দিব ভাবিতেছি, হঠাৎ নীচ হইতে বালক-কণ্ঠে ডাক আসিল, মাসিমা?

আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কে?

ও-বাড়ির মেজবৌয়ের ছেলে, এই বলিয়া সে ইঙ্গিতে পাশের বাড়িটা দেখাইয়া সাড়া দিল—ক্ষিতীশ, ওপরে এসো বাবা।

পরক্ষণেই একটি ষোল-সতের বছরে সুশ্রী বলিষ্ঠ কিশোর ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। আমাকে দেখিয়া প্রথমটা সঙ্কুচিত হইল, পরে নমস্কার করিয়া তাহার মাসিমাকেই কহিল, আপনার নামে কিন্তু বারো টাকা চাঁদা পড়েচে মাসিমা।

তা পড়ুক বাবা, কিন্তু সাবধানে সাঁতার কেটো, কোনো দুর্ঘটনা না হয়।

নাঃ—কোন ভয় নেই মাসিমা।

রাজলক্ষ্মী আলমারি খুলিয়া কাহার হাতে টাকা দিল, ছেলেটি দ্রুতবেগে সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে নামিতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিল, মা ব'লে দিলেন, ছোটমামা পরশু সকালে এসে সমস্ত এষ্টিমেট ক'রে দেবেন।—বলিয়াই ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থান করিল।

প্রশ্ন করিলাম, এষ্টিমেট কিসের?

বাড়িটা মেরামত করতে হবে না? তেতলার ঘরটা আধখানা ক'রে তারা ফেলে রেখেচে, পুরো করতে হবে না?

তা হবে কিন্তু এত লোককে তুমি চিনলে কি ক'রে?

বাঃ, এরা যে সব পাশের বাড়ির লোক; কিন্তু আর না। যাই—তোমার খাবার তৈরীর সময় হয়ে গেল।—এই বলিয়া সে উঠিয়া নীচে চলিয়া গেল।

॥ নয় ॥

এক সকালে স্বামীজি আনন্দ আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে আসার নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে রতন জানিত না, বিষণ্ণমুখে আসিয়া আমাকে খবর দিল, বাবু, গঙ্গামাটির সেই সাধুটা এসে হাজির হয়েছে। বলিহারী তাকে, খুঁজে খুঁজে বা'র করেছে ত?

রতন সর্বপ্রকার সাধু-সজ্জনকেই সন্দেহের চোখে দেখে, রাজলক্ষ্মীর গুরুদেবটিকে ত সে দুচক্ষে দেখিতে পারে না, বলিল, দেখুন, এ আবার মাকে কি মতলব দেয়। টাকা বা'র ক'রে নেবার কত ফন্দিই যে এই ধার্মিক ব্যাটারা জানে।

হাসিয়া বলিলাম, আনন্দ বড়লোকের ছেলে, ডাক্তারি পাস করেছে, তার নিজের টাকার দরকার নেই।

হুঁ—বড়লোকের ছেলে। টাকা থাকলে নাকি কেউ আবার এ-পথে যায়! এই বলিয়া সে তাহার সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিয়া চলিয়া গেল। রতনের আসল আপত্তি এইখানে, মায়ের টাকা কেহ ব'র করিয়া লইবার সে ঘোরতর বিরুদ্ধে। অবশ্য, তাহার নিজের কথা স্বতন্ত্র।

বজ্রানন্দ আসিয়া আমাকে নমস্কার করিল, কহিল, আর একবার এলুম দাদা। খবর ভালো ত? দিদি কৈ?

বোধ হয় পুজোয় বসেছেন, সংবাদ পান নি নিশ্চয়ই।

তবে সংবাদটা নিজেই দিই গে। পুজো করা পালিয়ে যাবে না, এখন একবার রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। পুজোর ঘরটা কোন্ দিকে দাদা? নাপ্‌তে ব্যাটা গেল কোথায়—চায়ের একটু জল চড়িয়ে দিক না।

পুজোর ঘরটা দেখাইয়া দিলাম। আনন্দ রতনের উদ্দেশে একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া সেইদিকে প্রস্থান করিল।

মিনিট-দুই পরে উভয়েই আসিয়া উপস্থিত হইল, আনন্দ কহিল, দিদি, গোটা-পাঁচেক টাকা দিন, চা খেয়ে একবার শিয়ালদার বাজারটা ঘুরে আসিগে।

রাজলক্ষ্মী বলিল, কাছেই যে একটা ভালো বাজার আছে, আনন্দ অত-দূর যেতে হবে কেন? আর তুমিই বা যাবে কিসের জন্য, রতন যাক না।

কে, রতা? ও ব্যাটাকে বিশ্বাস নেই দিদি, আমি এসেচি ব'লেই হয়ত ও বেছে বেছে পচামাছ কিনে আনবে—বলিয়াই হঠাৎ দেখিল রতন দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া; জিভ কাটিয়া বলিল, রতন দোষ নিও না বাবা, আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি ও-পাড়ায় গেছো—ডেকে সাড়া পাই নি কিনা।

রাজলক্ষ্মী হাসিতে লাগিল, আমিও না হাসিয়া পারিলাম না।

রতন কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিল না, গম্ভীর মুখে বলিল, আমি বাজারে যাচ্চি মা, কিন্তু চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছে।—বলিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী কহিল, রতনের সঙ্গে আনন্দের বুঝি বনে না?

আনন্দ বলিল, ওকে দোষ দিতে পারি নে দিদি। ও আপনার হিতৈষী—বাজে লোকজন ঘেঁষতে দিতে চায় না; কিন্তু আজ ওর সঙ্গ নিতে হবে, নইলে খাওয়াটা ভাল হবে না। বহুদিন উপবাসী।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়া ডাকিয়া বলিল, রতন, আর গোটা-কয়েক টাকা নিয়ে যা বাবা, বড় দেখে একটা রুইমাছ আনতে হবে কিন্তু। ফিরিয়া আসিয়া কহিল, হাত-মুখ ধুয়ে এসো গে ভাই, আমি চা তৈরি করে আনচি।—এই বলিয়া সেও নীচে নামিয়া গেল।

আনন্দ কহিল, দাদা, হঠাৎ তলব হ'লো কেন?

সে কৈফিয়ৎ কি আমার দেবার, আনন্দ?

আনন্দ সহাস্যে কহিল, দাদার দেখচি এখনো সেই ভাব—রাগ পড়ে নি। আবার গা ঢাকা দেবার মতলব নেই ত? সেবার গঙ্গামাটিতে কি হাঙ্গামাতেই ফেলেছিলেন। এদিকে দেশসুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন ওদিকে বাড়ির কর্তা নিরুদ্দেশ। মাঝখানে আমি—নতুন লোক—এদিকে ছুটি, ওদিকে ছুটি, দিদি পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন, রতন লোক তাড়াবার উদ্যোগ করলে—সে কি বিভ্রাট! আচ্ছা মানুষ আপনি।

আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম রাগ এবারে পড়ে গেছে, ভয় নেই।

আনন্দ বলিল, ভরসাও নেই। আপনাদের মতো নিঃসঙ্গ, একাকী লোকদের আমি ভয় করি। কেন যে নিজেকে সংসারে জড়াতে দিলেন তাই আমি অনেক সময় ভাবি।

মনে মনে বলিলাম, অদৃষ্ট। মুখে বলিলাম, আমাকে দেখচি তাহলে ভোলো নি, মাঝে মাঝে মনে করতে?

আনন্দ বলিল, না দাদা, আপনাকে ভোলাও শক্ত, বোঝাও শক্ত, মায়া কাটানো আরও শক্ত। বিশ্বাস না হয় বলুন, দিদিকে, ডেকে সাক্ষী মানি। আপনার সঙ্গে পরিচয় ত মাত্র দু-তিন দিনের কিন্তু সেদিন যে দিদির সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও কাঁদতে বসি নি—সেটা নিতান্তই সন্ন্যাসী-ধর্মের বিরুদ্ধে ব'লে।

বলিলাম, সেটা বোধ হয় দিদির খাতিরে। তাঁর অনুরোধেই ত এতদূরে এলে।

আনন্দ কহিল, নেহাৎ মিথ্যে নয় দাদা। ওঁর অনুরোধ ত অনুরোধ নয়, যেন মায়ের ডাক। পা আপনি চলতে শুরু করে। কত ঘরেই ত আশ্রয় নিই, কিন্তু ঠিক এমনটিই আর দেখি নে। আপনিও ত শুনেচি অনেক ঘুরেছেন, কোথাও দেখেছেন এঁর মত আর একটি?

বলিলাম, অনেক—অনেক।

রাজলক্ষ্মী প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়াই সে আমার কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল, চায়ের বাটিটা আনন্দের কাছে রাখিয়া দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি অনেক গা?

আনন্দ বোধ করি একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল ; আমি বলিলাম, তোমার গুণের কথা। উনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন ব'লেই আমি সজোরে তার প্রতিবাদ করছিলাম।

আনন্দ চায়ের বাটিটা মুখে তুলিতেছিল, হাসির তাড়ায় খানিকটা চা মাটিতে পড়িয়া গেল। রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল।

আনন্দ বলিল, দাদা, আপনার উপস্থিত বুদ্ধিটা অদ্ভুত। ঠিক উল্টোটি চোখের পলকে মাথায় এলো কি ক'রে ?

রাজলক্ষ্মী বলিল, আশ্চর্য কি আনন্দ ? নিজের মনের কথা চাপতে চাপতে আর গল্প বানিয়ে বলতে বলতে এ বিদ্যেয় উনি একেবারে মহামহোপাধ্যায় হয়ে গেছেন।

বলিলাম, আমাকে তা' হলে তুমি বিশ্বাস করো না ?

একটুও না।

আনন্দ হাসিয়া কহিল, বানিয়ে বলার বিদ্যেয় আপনিও কম নন, দিদি। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—একটুও না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, জ্বলে-পুড়ে শিখতে হয়েছে ভাই। তুমি কিন্তু আর দেরি ক'রো না, চা খেয়ে স্নান করে নাও, কাল গাড়িতে তোমার যে খাওয়া হয়নি তা বেশ জানি। ওঁর মুখে আমার সুখ্যাতি শুনতে গেলে তোমার সমস্ত দিনে কুলোবে না।—এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

আনন্দ কহিল, আপনাদের মত এমন দুটি লোক সংসারে বিরল। ভগবান আশ্চর্য মিল ক'রে আপনাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন।

তার নমুনা দেখলে ত ?

নমুনা, সেই প্রথম দিনে সাঁইথিয়া স্টেশনে গাছতলাতেই দেখেছিলুম। তার পরে আর একটিও কখনো চোখে পড়লো না।

আহা! কথাগুলো যদি ওঁর সামনেই বলতে আনন্দ!

আনন্দ কাজের লোক, কাজের উদ্যম ও শক্তি তাহার বিপুল। তাহাকে কাছে পাইয়া রাজলক্ষ্মীর আনন্দের সীমা নাই। দিনেরাতে খাওয়ার আয়োজন ত প্রায় ভয়ের কোঠায় গিয়া ঠেকিল। অবিশ্রাম দুজনের কত পরামর্শ-ই যে হয় তাহার সবগুলো জানি না, শুধু কানে আসিয়াছে যে গঙ্গামাটিতে একটা ছেলেদের ও একটা মেয়েদের ইস্কুল খোলা হইবে। ওখানে বিস্তর গরীব এবং ছোট-জাতের লোকের বাস, উপলক্ষ্য বোধ করি তাহারাই। শুনিতেছি একটা চিকিৎসার ব্যাপারও চলিবে। এই সকল বিষয়ে কোনোদিন আমার কিছুমাত্র পটুতা নাই। পরোপকারের বাসনা আছে কিন্তু শক্তি নাই, কোন-কিছু একটা খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে ভাবিলেও আমার শ্রান্ত মন আজ নয় কাল করিয়া দিন পিছাইতে চায়। তাহাদের নূতন উদ্যোগে মাঝে মাঝে আনন্দ আমাকে টানিতে গিয়াছে, কিন্তু রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বাধা দিয়া বলিয়াছে, ওঁকে আর জড়িও না আনন্দ, তোমার সমস্ত সংকল্প পণ্ড হয়ে যাবে।

শুনিলে প্রতিবাদ করিতেই হয়, বলিলাম, এই যে সেদিন বললে আমার অনেক কাজ, এখন থেকে আমাকে অনেক কিছু করতে হবে!

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, আমার ঘাট হয়েছে গোঁসাই, অমন কথা আর কখনো মুখে আনবো না।

তবে কি কোনোদিন কিছুই করবো না?

কেন করবে না? কেবল অসুখ-বিসুখ ক'রে আমাকে ভয়ে আধমরা ক'রে তুলো না, তাতেই তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

আনন্দ কহিল, দিদি, সত্যিই ওঁকে আপনি অকেজো ক'রে তুলবেন।

রাজলক্ষ্মী বলিল, আমাকে করতে হবে না ভাই, যে বিধাতা ওঁকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই সে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন—কোথাও ত্রুটি রাখেন নি।

আনন্দ হাসিতে লাগিল, রাজলক্ষ্মী বলিল, তার ওপর এক গোণক্কার পোড়ারমুখো এমনি ভয় দেখিয়ে রেখেচে যে উনি বাড়ির ব'র হলে আমার বুক টিপ টিপ করে—যতক্ষণ না ফেরেন, কিছুতে নন দিতে পারি নে।

এর মধ্যে আবার গোণক্কার জুটলো কোথা থেকে? কি বললে সে?

আমি ইহার উত্তর দিলাম, বলিলাম, আমার হাত দেখে সে বললে, আমার মস্ত ফাঁড়া—জীবন-মরণের সমস্যা।

দিদি, এসব আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি বলিলাম, হাঁ করেন, আলবৎ করেন। তোমার দিদি বলেন, ফাঁড়া বলে কি পৃথিবীতে কথা নেই? কারও কখনো কি বিপদ ঘটে না?

আনন্দ হাসিয়া কহিল, ঘটতে পারে, কিন্তু হাত গুণে বলবে কি দিদি?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তা জানি নে ভাই, শুধু আমার ভরসা আমার মতো ভাগ্যবতী যে, তাকে কখনো ভগবান এত বড় দুঃখে ডোবাবেন না।

আনন্দ স্তব্ধমুখে ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া অন্য কথা পাড়িল।

ইতিমধ্যে বাড়ির লেখাপড়া, বিলিব্যবস্থার কাজ চলিতে লাগিল, রাশীকৃত ইট-কাঠ, চুন-সুরকি, দরজা-জানালা আসিয়া পড়িল—পুরাতন গৃহটিকে রাজলক্ষ্মী নূতন করিয়া তুলিবার আয়োজন করিল।

সেদিন বৈকালে আনন্দ কহিল, দাদা, চলুন একটু ঘুরে আসিগে।

ইদানীং আমার বাহির হইবার প্রস্তাবেই রাজলক্ষ্মী অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকে, কহিল ঘুরে আসতে আসতেই যে রাত হয়ে যাবে আনন্দ, ঠাণ্ডা লাগবে না?

আনন্দ বলিল, গরমে লোকে সারা হচ্চে দিদি, ঠাণ্ডা কোথায়?

আজ আমার নিজের শরীরটাও বেশ ভালো ছিল না, বললাম, ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ উঠতেও তেমন ইচ্ছে হচ্ছে না আনন্দ।

আনন্দ বলিল, ওটা জড়তা। সন্ধ্যেটা ঘরে ব'সে থাকলে অনিচ্ছে আরও চেপে রবে—উঠে পড়ুন।

রাজলক্ষ্মী ইহার সমাধান করিতে কহিল, তার চেয়ে একটা কাজ করি নে আনন্দ। ক্ষিতীশ পরশু আমাকে একটি ভালো হারমোনিয়াম কিনে দিয়ে গেছে, এখনো সেটা দেখবার সময় পাই নি। আমি দুটো ঠাকুরদের নাম করি, তোমরা দুজনে বসে শোনো, সন্ধ্যেটা কেটে যাবে।—এই বলিয়া সে রতনকে ডাকিয়া বাক্সটা আনিতে কহিল।

আনন্দ বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ঠাকুরদের নাম মানে কি গান নাকি দিদি?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

—দিদির কি এ বিদ্যেও আছে নাকি?

সামান্য একটুখানি। তারপরে আমাকে দেখাইয়া কহিল—ছেলেবেলায় ওঁর কাছেই হাতেখড়ি।

আনন্দ খুশি হইয়া বলিল, দাদাটি দেখচি বর্ণচোরা আম, বাইরে থেকে ধরবার জো নেই।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী হাসিতে লাগিল, কিন্তু আমি সরল মনে তাহাতে যোগ দিতে পারিলাম না। কারণ, আনন্দ বুঝিবে না কিছুই আমার আপত্তিকে ওস্তাদের বিনয়-বাক্য কল্পনা করিয়া ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করিতে থাকিবে, এবং হয়ত বা শেষে রাগ করিয়া বসিবে। পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপের দুর্যোধনের গানটা জানি, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর পরে এ আসরে সেটা মানানসই হইবে না।

হারমোনিয়াম আসিলে প্রথমে সচরাচর প্রচলিত দুই-একটা 'ঠাকুরদের' গান গাহিয়া রাজলক্ষ্মী বৈষ্ণবীপদাবলী আরম্ভ করিল, শুনিয়া মনে হইল সেদিন মুরারিপুরে আখড়াতেও বোধ করি এমনটি শুনি নাই। আনন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল, আমাকে দেখাইয়া মুগ্ধচিত্তে কহিল, এ কি সমস্তই ওঁর কাছে শেখা দিদি?

সমস্তই কি কেউ একজনের কাছে শেখে আনন্দ?

সে ঠিক। তারপরে সে আমার প্রতি চাহিয়া কহিল, দাদা, এবার কিন্তু আপনাকে অনুগ্রহ করতে হবে। দিদি একটু ক্লান্ত।

না হে, আমার শরীর ভালো নেই।

শরীরের জন্য আমি দায়ী, অতিথির অনুরোধ রাখবেন না?

রাখবার জো নেই হে, শরীর বড়ো খারাপ।

রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু সামলাইতে পারিল না, হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। আনন্দ ব্যাপারটা এবারে বুঝিল, কহিল দিদি, তবে বলুন কার কাছে এত শিখলেন?

আমি বলিলাম, যাঁরা অর্থের পরিবর্তে বিদ্যা দান করেন তাঁদের কাছে, আমার কাছে নয় হে; দাদা কখনো এ বিদ্যের ধার দিয়েও চলেন নি।

আনন্দ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আমিও সামান্য কিছু জানি দিদি, কিন্তু বেশি শেখবার সময় পাই নি। সুযোগ যদি হলো এবার আপনার শিষ্যত্ব নিয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করবো; কিন্তু আজ কি এখানেই থেমে যাবেন, আর কিছু শোনাবেন না?

রাজলক্ষ্মী বলিল, আজ ত সময় নেই ভাই, তোমার খাবার তৈরি করতে হবে যে।

আনন্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তা জানি। সংসারের ভার যাঁদের ওপর, সময় তাঁদের কম; কিন্তু বয়সে আমি ছোট, আপনার ছোট ভাই, আমাকে শেখাতে হবে। অপরিচিত স্থানে একলা যখন সময় কাটতে চাইবে না, তখন এই দয়া আপনার স্মরণ করবো।

রাজলক্ষ্মী স্নেহে বিগলিত হইয়া কহিল, তুমি ডাক্তার, বিদেশে তোমার এই স্বাস্থ্যহীন দাদাটির প্রতি দৃষ্টি রেখো ভাই, আমি যতটুকু জানি তোমাকে আদর ক'রে শেখাবো।

কিন্তু এ ছাড়া আপনার কি আর চিন্তা নেই দিদি?

রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল, আনন্দ আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, দাদার মতো ভাগ্য সহসা চোখে পড়ে না।

আমি ইহার উত্তর দিলাম, বলিলাম, এমন অকর্মণ্য ব্যক্তিই কি সহসা চোখে পড়ে আনন্দ? ভগবান তাদের হাল ধরবার মজবুত লোক দেন, নইলে তারা অকূলে ভেসে যায়—কোনকালে ঘাটে ভিড়তে পারে না। এমনিই করেই সংসারে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় ভায়া, কথাটা মিলিয়ে দেখো, প্রমাণ পাবে।

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল—তাহার অনেক কাজ।

ইহার দিনকয়েকের মধ্যেই বাড়ির কাজ শুরু হইল, রাজলক্ষ্মী জিনিস-পত্র একটা ঘরে বন্ধ করিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। বাড়ির ভার রহিল বুড়ো তুলসীদাসের ওপরে।

যাবার দিনে রাজলক্ষ্মী আমার হাতে একখানা পোষ্টকার্ড দিয়া বলিল, আমার চার-পাতা জোড়া চিঠির এই জবাব এল—পড়ে দেখ।—বলিয়া চলিয়া গেল।

মেয়েলী অক্ষরে গুটি দুই-তিন ছত্রের লেখা। কমললতা লিখিয়াছে—

সুখেই আছি বোন। যাঁদের সেবায় আপনাকে নিবেদন করেছি, আমাকে ভালো রাখবার দায় যে তাঁদের ভাই। প্রার্থনা করি তোমরা কুশলে থাকো। বড়গোঁসাইজী তাঁহার আনন্দময়িকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ইতি—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণাশ্রিত—কমললতা

সে আমার নাম উল্লেখও করে নাই; কিন্তু এই কয়টি অক্ষরের আড়ালে কত কথাই না তাহার রহিয়া গেল। খুঁজিয়া দেখিলাম একফোঁটা চোখের জলের দাগ কি কোথাও পড়ে নাই? কিন্তু কোন চিহ্নই চোখে পড়িল না।

চিঠিখানা হাতে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। জানালার বাহিরে রৌদ্রতপ্ত নীলাভ আকাশ, প্রতিবেশী-গৃহের একজোড়া-নারিকেল বৃক্ষের পাতার ফাঁক দিয়ে কতকটা অংশ তাহার দেখা যায়, সেখানে অকস্মাৎ দুটি মুখ পাশাপাশি যেন ভাসিয়া আসিল। একটি আমার রাজলক্ষ্মীর—কল্যাণের প্রতিমা; অপরটি কমললতার, অপরিস্ফুট, অজানা—যেন স্বপ্নে দেখা ছবি।

রতন আসিয়া ধ্যান ভাঙিয়া দিল, বলিল, স্নানের সময় হয়েছে বাবু, মা ব'লে দিলেন।

স্নানের সময়টুকুও উত্তীর্ণ হইবার জো নাই।

আবার একদিন সকালে গঙ্গামাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেবার আনন্দ ছিল অনাহূত অতিথি, এবারে সে আমন্ত্রিত বান্ধব। বাড়িতে ভিড় ধরে না, গ্রামের আত্মীয়-অনাত্মীয় কত লোকই যে আমাদের দেখিতে আসিয়াছে, সকলের মুখেই প্রসন্ন হাসি ও কুশল প্রশ্ন। রাজলক্ষ্মী কুশারী-গৃহিণীকে প্রণাম করিল, সুনন্দা রান্নাঘরে কাজে নিযুক্ত ছিল, বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে প্রণাম করিয়া বলিল, দাদা, আপনার শরীরটা ত ভাল দেখাচ্চে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, ভালো আর কবে দেখায় ভাই? আমি ত পারলুম না, এবার তোমরা যদি পারো এই আশাতেই তোমাদের কাছে এনে ফেললুম।

আমার বিগত দিনের অস্বাস্থ্যের কথা বড়গিন্নীর বোধ হয় মনে পড়িল, স্নেহার্দ্র কণ্ঠে ভরসা দিয়া কহিলেন, ভয় নেই মা, এদেশের জল-হাওয়ায় উনি দুদিনেই সেরে উঠবেন।

অথচ, নিজে ভাবিয়া পাইলাম না, কি আমার হইয়াছে এবং কিসের জন্যই বা এত দুশ্চিন্তা।

অতঃপর নানাবিধ কাজের আয়োজন পূর্ণোদ্যমে শুরু হইল। পোড়া-মাটি ক্রয় করার কথাবার্তা দামদস্তুর হইতে আরম্ভ করিয়া শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থানান্বেষণ প্রভৃতি কিছুতেই, কাহারো আলস্য রহিল না।

শুধু আমিই কেবল মনের মধ্যে উৎসাহ বোধ করি না। হয়ত এ আমার স্বভাব, হয়তো বা ইহা আর কিছু একটা যাহা দৃষ্টির অগোচরে ধীরে ধীরে আমার সমস্ত প্রাণশক্তির মূলোচ্ছেদ করিতেছে। একটা সুবিধা হইয়াছিল আমার ঔদাস্যে কেহ বিস্মিত হয় না, যেন আমার কাছে অন্য কিছু প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। আমি দুর্বল, আমি অসুস্থ, আমি কখন আছি, কখন নাই। অথচ কোন অসুখ নাই, খাইদাই থাকি। আনন্দ তাহার ডাক্তারি-বিদ্যা লইয়া মাঝে মাঝে আমাকে নাড়াচাড়া দিবার চেষ্টা করিলেই রাজলক্ষ্মী সস্নেহে অনুযোগে বাধা দিয়া বলে, ওঁকে টানাটানি ক'রে কাজ নেই ভাই, কি হ'তে কি হবে, তখন আমাদেরই ভুগে মরতে হবে।

আনন্দ বলে, যে ব্যবস্থা করচেন, ভোগার মাত্রা এতে বাড়বে বৈ কমবে না দিদি। এ আপনাকে সাবধান করে দিচ্চি।

রাজলক্ষ্মী সহজেই স্বীকার হইয়া বলে, সে আমি জানি আনন্দ, ভগবান আমার জন্মকালে এ দুঃখ কপালে লিখে রেখেছেন।

ইহার পরে আর তর্ক চলে না।

দিন কাটে কখনো বই পড়িয়া, কখনো নিজের বিগত-কাহিনী খাতায় লিখিয়া, কখনো বা শূন্য মাঠে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইয়া। এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে কর্মের প্রেরণা আমাতে নাই; লড়াই করিয়া হুটোপুটি করিয়া, সংসারে দশজনের ঘাড়ে চড়িয়া বসার সাধ্যও নাই, সঙ্কল্পও নাই। সহজে যাহা পাই তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মানি।

বাড়িঘর টাকাকড়ি বিষয়-আশয় মান- সম্ভ্রম এ-সকল আমার কাছে ছায়াময়। অপরের দেখাদেখি নিজের জড়ত্বকে যদিবা কখনো কর্তব্যবুদ্ধির তাড়নায় সচেতন করিতে যাই, অচিরকাল মধ্যেই দেখি আবার সে চোখ বুজিয়া ঢুলিতেছে—শত ঠেলাঠেলিতেও আর গা নাড়িতে চাহে না। শুধু দেখি, একটা বিষয়ে তন্দ্রাতুর মন কলরবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে, সে ঐ মুরারিপুরের দশটা দিনের স্মৃতির আলোড়নে। ঠিক যেন কানে শুনিতে পাই বৈষ্ণবী কমললতার সস্নেহ অনুরোধ—নতুন গোঁসাই, একটি করে দাও না ভাই! ঐ যাঃ—সব নষ্ট ক'রে দিলে? আমার ঘাট হয়েছে গো, তোমায় কাজ করতে ব'লে—নাও ওঠো। পদ্মা পোড়ারমুখী গেল কোথায়, একটু জল চড়িয়ে দিক না, চা খাবার যে তোমার সময় হয়েছে গোঁসাই।

সেদিন চায়ের পাত্রগুলি সে নিজে ধুইয়া রাখিতে পাছে ভাঙে। আজ তাহাদের প্রয়োজন গিয়াছে ফুরাইয়া, তথাপি কখনো কাজে লাগার আশায় কি জানি সেগুলি সে যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে কিনা।

জানি সে পালাই পালাই করিতেছে। হেতু জানি না, তবু মনে সন্দেহ নাই মুরারিপুর আশ্রমে দিন তাহার প্রতিদিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। হয়ত, একদিন এই খবরটাই অকস্মাৎ আসিয়া পৌঁছিবে! নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল, পথে পথে সে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে মনে করিলেই চোখে জল আসিয়া পড়ে। দিশেহারা মন সান্ত্বনার আশ্রয় ফিরিয়া চাহে রাজলক্ষ্মীর পানে। সকলের সকল শুভ-চিন্তায় অবিশ্রাম কর্মে নিযুক্ত—কল্যাণ যেন তাহার দুই হাতের দশ অঙ্গুলি দিয়া অজস্রধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। সুপ্রসন্ন মুখে শান্তি ও পরি-তৃপ্তির স্নিগ্ধ ছায়া; করুণায় মমতায় হৃদয়-যমুনা কূলে কূলে পূর্ণ—নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের সর্বব্যাপী মহিমায় আমার চিত্রলোকে সে যে-আসনে অধিষ্ঠিত, তাহার তুলনা করিতে পারি এমন কিছুই জানি না।

বিদুষী সুনন্দার দুর্নিবার্য প্রভাব স্বল্পকালের জন্যও যে তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, ইহারই দুঃসহ পরিতাপে পুনরায় আপন সত্তাকে সে ফিরিয়া পাইয়াছে। একটা কথা সে আজও আমাকে কানে কানে বলে, তুমি কম নও গো. কম নও। তোমার চ'লে যাবার পথ বেয়ে সর্বস্ব যে আমার চোখের পলকে ছুটে পালাবে, এ কে জানতো, বলো? উঃ—সে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ভাবলেও ভয় হয় সে দিনগুলো আমার কেটেছিল কি ক'রে? দম বন্ধ হয়ে ম'রে যাইনি এই আশ্চর্য্য। আমি উত্তর দিতে পারি না, শুধু নীরবে চাহিয়া থাকি।

আমার সম্বন্ধে আর তাহার ত্রুটি ধরিবার জো নাই। শতকর্মের মধ্যে শতবার অলক্ষ্যে আসিয়া দেখিয়া যায়। কখনো হঠাৎ আসিয়া কাছে বসে, হাতের বইটা সরাইয়া দিয়া বলে, চোখ বুজে একটুখানি শুয়ে পড়তো, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। অতো পড়লে চোখ ব্যথা করবে যে!

আনন্দ আসিয়া বাহির হইতে বলে, একটা কথা জেনে নেবার আছে—আসতে পারি কি?

রাজলক্ষ্মী বলে, পারো। তোমার কোথায় আসতে মানা আনন্দ?

আনন্দ ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য হইয়া বলে, এ অসময়ে দিদি কি ওঁকে ঘুম পাড়াচ্চেন নাকি ?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া জবাব দেয়, তোমার লোকসানটা হলো কি ? না ঘুমোলেও ত তোমার পাঠশালার বাছুরের পাল চরাতে যাবেন না।

দিদি দেখচি ওঁকে মাটি করবেন।

নইলে নিজে যে মাটি। নির্ভাবনায় কাজকর্ম করতে পারি নে।

আপনারা দুজনেই ক্রমশঃ ক্ষেপে যাবেন, এই বলিয়া আনন্দ বাহির হইয়া যায়।

ইস্কুল তৈরী কাজে আনন্দের নিশ্বাস ফেলিবার ফুরসৎ নাই, সম্পত্তি খরিদের হাঙ্গামায় রাজলক্ষ্মী গলদঘর্ম, এমনি সময়ে কলিকাতার বাড়ি ঘুড়িয়া বহু ডাকঘরে ছাপছোপ পিঠে লইয়া বহু বিলম্বে নবীনের সাংঘাতিক চিঠি আসিয়া পেঁাছিল— গহর মৃত্যুশয্যায়। শুধু আমারই পথ চাহিয়া আজও সে বাঁচিয়া আছে। খবরটা আমাকে যেন শূল দিয়া বিঁধিল। ভগিনীর বাটি হইতে সে কবে ফিরিয়াছে জানি না। সে যে এতদূর পীড়িত তাহাও শুনি নাই—শুনিবার বিশেষ চেষ্টাও করি নাই—আজ আসিয়াছে একেবারে শেষ সংবাদ। দিন ছয়ের পূর্বের চিঠি, এখনো বাঁচিয়া আছে কিনা তাই বা কে জানে ? তার করিয়া খবর পাবার ব্যবস্থা এদেশেও নাই, সে-দেশেও নাই। ও চিন্তা বৃথা। চিঠি পড়িয়া রাজলক্ষ্মী মাথায় হাত দিল— তোমাকে যেতে হবে ত।

হাঁ।

চলো আমিও সঙ্গে যাই।

সে কি হয় ? তাদের এ বিপদের মাঝে তুমি যাবে কোথা ?

প্রস্তাবটা যে অসঙ্গত সে নিজেই বুঝিল, মুরারিপুর আখড়ার কথা আর সে মুখে আনিতে পারিল না, বলিল, রতনের কাল থেকে জ্বর, সঙ্গে যাবে কে ? আনন্দকে বলবো ?

না। আমার তল্পি বইবার লোক সে নয়।

তবে কিষণ সঙ্গে যাক।

তা যাক, কিন্তু প্রয়োজন ছিল না।

গিয়ে রোজ চিঠি দেবে বলো ?

সময় পেলে দেব।

না, সে শুনবো না। একদিন চিঠি না পেলে আমি নিজে যাবো, তুমি যতই রাগ করো।

অগত্যা রাজী হইতে হইল, এবং প্রত্যহ সংবাদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সেইদিনই বাহির হইয়া পড়িলাম। চাহিয়া দেখিলাম দুশ্চিন্তায় রাজলক্ষ্মীর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে, সে চোখ মুছিয়া শেষবারের মতো সাবধান করিয়া কহিল, শরীরে অবহেলা করবে না বলো ?

না গো না।

ফিরতে একটা দিনও বেশি দেরি করবে না বলো ?

না, তাও করবো না।

অবশেষে গরুর গাড়ি রেল-স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করিল।

আষাঢ়ের এক অপরাহ্ন-বেলায় গহরদের বাটির সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমার সাড়া পাইয়া নবীন বাহিরে আসিয়া আমার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। যে-ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষের প্রবল কণ্ঠের এই বুকফাটা কান্নায় শোকের একটা নূতন মূর্তি চোখে দেখিতে পাইলাম। সে যেমন গভীর, তেমনি বৃহৎ ও তেমনি সত্য। গহরের মা নাই, ভগ্নী নাই, কন্যা নাই, জায়া নাই, অশ্রুজলের মালা পরাইয়া এই সঙ্গীহীন মানুষটিকে সেদিন বিদায় দিতে কেহ ছিল না, তবু মনে হয় তাহার সজ্জাহীন, ভূষণহীন কাঙ্গাল-বেশে যাইতে হয় নাই, তাহার লোকান্তরের যাত্রাপথে শেষ পাথেয় নবীন একাকী দুহাত ভরিয়া ঢালিয়া দিয়াছে।

বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া বসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, গহর কবে মারা গেল নবীন ?

পরশু। কাল সকালে আমরা তাঁকে মাটি দিয়ে এসেছি।

মাটি কোথায় দিলে ?

নদীর তীরে, আমবাগানে। তিনিই বলেছিলেন।

নবীন বলিতে লাগিল, মামাতো-বোনের বাড়ি থেকে জ্বর নিয়ে ফিরলেন, সে জ্বর আর সারলো না।

চিকিৎসা হয়েছিল।

এখানে যা হবার সমস্তই হয়েছিল—কিছুতেই কিছু হলো না। বাবু নিজেই সমস্ত জানতে পেরেছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, আখড়ার বড়গোঁসাইজী আসতেন ?

নবীন কহিল, মাঝে মাঝে। নবদ্বীপ থেকে তাঁর গুরুদেব এসেছেন, তাই রোজ আসতে সময় পেতেন না। আর একজনের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা করিতে লাগিল, তবু সংকোচ কাটাইয়া প্রশ্ন করিলাম, ওখান থেকে আর কেউ আসতো না নবীন ?

নবীন বলিল, হাঁ কমললতা।

তিনি কবে এসেছিলেন ?

নবীন বলিল, রোজ। শেষ তিনদিন তিনি খান নি, শোন নি, বাবুর বিছানা ছেড়ে একটিবার ওঠেন নি।

আর প্রশ্ন করিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। নবীন জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবেন এখন—আখড়ায় ?

হাঁ।

একটু দাঁড়ান, বলিয়া সে ভিতরে গিয়া একটা টিনের বাক্স বাহির করিয়া আনিয়া

আমার কাছে দিয়া বলিল, এটা আপনাকে দিতে তিনি ব'লে গিয়েছেন।

কি আছে এতে নবীন?

খুলে দেখুন বলিয়া সে আমার হাতে চাবি দিল। খুলিয়া দেখিলাম দড়ি দিয়ে বাঁধা তাঁহার কবিতার খাতাগুলা। উপরে লিখিয়াছে, শ্রীকান্ত, রামায়ণ শেষ করার সময় হলো না। বড় গোঁসাইকে দিও, তিনি যেন মঠে রেখে দেন, নষ্ট না হয়। দ্বিতীয়টি লাল শালুতে বাঁধা ছোট পুঁটুলি। খুলিয়া দেখিলাম, নানা মূল্যের এক তাড়া নোট এবং আমাকে লেখা আর একখানি পত্র। সে লিখিয়াছে—ভাই শ্রীকান্ত, আমি বোধ হয় বাঁচবো না। তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানি নে। যদি না হয় নবীনের হাতে বাক্সটি রেখে গেলাম, নিও। টাকাগুলি তোমার হাতে দিলাম, কমললতার যদি কাজে লাগে দিও। না নিলে যা ইচ্ছে ক'রো। আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন।—গহর।

দানের গর্ব নাই, কাকুতি-মিনতিও নাই। শুধু মৃত্যু আসন্ন জানিয়া এই গুটিকয়েক কথায় বাল্যবন্ধুর শুভকামনা করিয়া তাহার শেষ নিদেন রাখিয়া গিয়াছে। ভয় নাই, ক্ষোভ নাই, উচ্ছ্বসিত হা-হুতাশে মৃত্যুকে সে প্রতিবাদ করে নাই। সে কবি, মুসলমান ফকির বংশের রক্ত তাহার শিরায়—শান্ত মনে এই শেষ রচনাটুকু সে তাহার বাল্যবন্ধুর উদ্দেশে লিখিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ পর্যন্ত চোখের জল আমার পড়ে নাই, কিন্তু আর তাহারা নিষেধ মানিল না, বড় বড় ফোঁটায় চোখের কোণ বহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনমান তখন সমাপ্তির দিকে পশ্চিমে দিগন্ত ব্যাপিয়া একটা কালো মেঘের স্তর উঠিতেছে উপরে, তাহারই কোন একটা সংকীর্ণ ছিদ্রপথে অস্তোন্মুখ সূর্য্যরশ্মি রাঙা হইয়া আসিয়া পড়িল প্রাচীর সংলগ্ন সেই শুষ্ক-প্রায় জাম গাছটার মাথায়। ইহারই শাখা জড়াইয়া উঠিয়াছিল গহরের মাধবী ও মালতী লতার কুঞ্জ। সেদিন শুধু কুঁড়ি ধরিয়াছিল, ইহারই গুটিকয়েক আমাকে সে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কেবল কাঠপিঁপড়ার ভয়ে পারে নাই। আজ তাহাতে গুচ্ছে গুচ্ছে ফুল, কতক ঝরিয়াছে তলায়, কতক বাতাসে উড়িয়া ছড়াইয়াছে আশেপাশে, ইহার কতকগুলি কুড়াইয়া লইলাম বাল্যবন্ধুর স্বহস্তে শেষ দান মনে করিয়া।

নবীন বলিল, চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি গে।

বলিলাম, নবীন, বাইরের ঘরটা একবার খুলে দাও না, দেখি।

নবীন ঘর খুলিয়া দিল। আজও রহিয়াছে সেই বিছানাটি তক্তপোষের একধারে গুটানো, একটি ছোট পেন্সিল, কয়েক টুকরা ছেঁড়া-কাগজ—এই ঘরে গহর সুর করিয়া শুনাইয়াছিল তাহার স্বরচিত কবিতা—বন্দিনী সীতার দুঃখের কাহিনী। এই গৃহে কতবার আসিয়াছি, কতদিন খাইয়াছি, শুইয়াছি, উপদ্রব করিয়া গিয়াছি, সেদিন হাসি-মুখে যাহারা আসিয়াছিল, আজ তাহাদের কেহ জীবিত নাই। আজ সমস্ত আসা-যাওয়া শেষ করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

পথে নবীনের মুখে শুনিলাম, এমনি একটি ছোট নোটের পুঁটলি তাহার ছেলেদের

হাতেও গহর দিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট সম্পত্তি যাহা যাহা রহিল পাইবে তাহার মামাতো ভাই-বোনেরা এবং তাহার পিতার নির্মিত একটি মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলাম মস্ত ভিড়। গুরুদেবের শিষ্য-শিষ্যা অনেক সঙ্গে আসিয়াছে, বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছে, এবং হাবভাবে তাহাদের শীঘ্র বিদায় হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। বৈষ্ণব-সেবাদি বিধিমতেই চলিতেছে অনুমান করিলাম।

দ্বারিকাদাস আমাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আমার আগমনের হেতু তিনি জানেন। গহরের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মুখে কেমন যেন একটা বিব্রত, উদ্‌ভ্রান্ত ভাব—পূর্বে কখনো দেখি নাই। আন্দাজ করিলাম হয়ত এতদিন ধরিয়া এতগুলি বৈষ্ণব পরিচর্যায় তিনি ক্লান্ত, বিপর্যস্ত; নিশ্চিন্ত হইয়া আলাপ করিবার সময় নাই।

খবর পাইয়া পদ্মা আসিল, আজ তাহার মুখেও হাসি নাই, যেন সঙ্কুচিত—পলাইতে পারিলে বাঁচে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কমললতাদিদি এখন বড় ব্যস্ত, না পদ্মা!

না, ডেকে দেবো দিদিকে?—বলিয়াই চলিয়া গেল। এ সমস্তই আজ এমন অপ্রত্যাশিত, খাপছাড়া যে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। একটু পরে কমললতা আসিয়া নমস্কার করিল, বলিল, এস গোঁসাই, আমার ঘরে গিয়ে বসবে চলো।

আমার বিছানা প্রভৃতি স্টেশনে রাখিয়া শুধু ব্যাগটাই সঙ্গে আনিয়াছিলাম, আর ছিল গহরের সেই বাক্সটা আমার চাকরের মাথায়। কমললতার ঘরে আসিয়া সেগুলো তাহার হাতে দিয়া বলিলাম, একটু সাবধানে রেখে দাও, বাক্সটায় অনেকগুলো টাকা আছে।

কমললতা বলিল, জানি। তারপরে খাটের নীচে সেগুলো রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চা খাওয়া হয়নি বোধ হয়?

না।

কখন এলে?

বিকেলবেলা।

যাই, তৈরি করে আনি গে, বলিয়া চাকরটাকে সঙ্গে করিয়া উঠিয়া গেল।

পদ্মা মুখ-হাত ধোয়ার জল দিয়া চলিয়া গেল, দাঁড়াইল না।

আমার মনে হইল, ব্যাপার কি?

খানিক পরে কমললতা চা লইয়া আসিল, আর কিছু ফল-মূল-মিষ্টান্ন ও-বেলার ঠাকুরের প্রসাদ। বহুক্ষণ অভুক্ত—অবিলম্বে বসিয়া গেলাম।

অনতিবিলম্বে ঠাকুরের সন্ধ্যারতির শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরের শব্দ আসিয়া পৌঁছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, কই তুমি গেলে না?

না, আমার বারণ।

বারণ? তোমার? তার মানে?

কমললতা ম্লান হাসিয়া কহিল, বারণ মানে বারণ গোঁসাই। অর্থাৎ ঠাকুরঘরে যাওয়া আমার নিষেধ।

আহারে রুচি চলিয়া গেল—বারণ করলে কে?

বড়গোঁসাইজীর গুরুদেব। আর যাঁরা সঙ্গে এসেছেন—তাঁরা।

কি বলেন তাঁরা?

বলেন আমি অশুচি, আমার সেবায় ঠাকুর কলুষিত হন।

অশুচি তুমি? বিদ্যুদ্বেগে একটা কথা মনে জাগিল—সন্দেহ কি গহরকে নিয়ে?

হ্যাঁ, তাই।

কিছুই জানি না, তবুও অসংশয়ে বলিয়া উঠিলাম, এ মিথ্যে—এ অসম্ভব।

অসম্ভব কেন গোঁসাই?

তা জানি না কমললতা, কিন্তু এত বড় মিথ্যে আর নেই। মনে হয় মানুষের সমাজে এ তোমার মৃত্যু-পথযাত্রী বন্ধুর ঐকান্তিক সেবার শেষ পুরস্কার!

তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল, বলিল, আর আমার দুঃখ নেই। ঠাকুর অন্তর্যামী, তাঁর কাছে ত ভয় ছিল না, ছিল শুধু তোমাকে? আজ আমি নির্ভয় হয়ে বাঁচলুম, গোঁসাই।

সংসারে এতলোকের মাঝে তোমার ভয় ছিল শুধু আমাকে? আর কাউকে নয়?

না—আর কাউকে না। শুধু তোমাকে।

ইহার পরে দুইজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। একসময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, বড়-গোঁসাইজী কি বলেন?

কমললতা কহিল, তাঁর ত কোন উপায় নেই। নইলে কোন বৈষ্ণবই যে এ মঠে আর আসবে না। একটু পরে বলিল, এখানে থাকা চলবে না, একদিন আমাকে যেতে হবে তা জানতুম, শুধু এমনি ক'রে যে যেতে হবে তা ভাবি নি গোঁসাই। কেবল কষ্ট হয় পদ্মার কথা মনে ক'রে। ছেলেমানুষ, তার কোথাও কেউ নেই—বড়গোঁসাই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তাকে নবদ্বীপে, দিদি চ'লে গেলে সে বড্ড কাঁদবে। যদি পারো তাকে একটু দেখো। এখানে থাকতে যদি না চায়, আমার নাম ক'রে তাকে রাজুকে দিয়ে দিও—ওর যা ভালো সে তা করবেই করবে।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই টাকাগুলো কি হবে?

না। আমি ভিখারী, টাকা নিয়ে কি করবো বলো ত?

তবু যদি কখনো কাজে লাগে—

কমললতা এবার হাসিয়া বলিল, টাকা আমারো ত একদিন অনেক ছিল গো, কি কাজে লাগলো? তবু যদি কখনো দরকার হয় তুমি আছো কি করতে? তখন তোমার কাছে চেয়ে নেবো—অপরের টাকা নিতে যাবো কেন?

এ কথায় কি যে বলিব ভাবিয়া পাইলাম না, শুধু তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম।

সে পুনশ্চ কহিল, না গোঁসাই, আমার টাকা চাইনে, যাঁর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ

করেচি, তিনি আমাকে ফেলবেন না। যেখানেই যাই সব অভাব তিনিই পূর্ণ ক'রে দেবেন। লক্ষ্মীটি, আমার জন্যে ভেবো না।

পদ্মা ঘরে আসিয়া বলিল, নতুনগোঁসাইয়ের জন্যে প্রসাদ কি এ ঘরেই আনবো দিদি?

হাঁ, এখানেই নিয়ে এসো। চাকরটিকে দিলে?

হাঁ দিয়েছি।

তবু পদ্মা যায় না, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তুমি খাবে না দিদি?

খাবো রে পোড়ারমুখী খাবো। তুই যখন আছিস্ তখন না খেয়ে কি দিদির নিস্তার আছে?

পদ্মা চলিয়া গেল।

সকালে উঠিয়া কমললতাকে দেখিতে পাইলাম না। পদ্মার মুখে শুনিলাম সে বিকালে আসে। সারাদিন কোথায় থাকে কেহ জানে না। তবু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না, রাত্রের কথা স্মরণ করিয়া কেবলি ভয় হইতে লাগিল, পাছে সে চলিয়া গিয়া থাকে, আর দেখা না হয়।

বড়গোঁসাইজীর ঘরে গেলাম। খাতাগুলি রাখিয়া বলিলাম, গহরের রামায়ণ। তার ইচ্ছে এগুলি মঠে থাকে।

দ্বারিকদাস হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তাই হবে নতুন গোঁসাই। যেখানে মঠের সব গ্রন্থ থাকে, তার সঙ্গেই এটি তুলো রাখবো।

মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলাম, তার সম্বন্ধে কমললতার অপবাদই তুমি বিশ্বাস করো গোঁসাই?

দ্বারিদাস মুখ তুলিয়া কহিলেন, আমি? কখ্খনো না।

তবু ত তাকে চ'লে যেতে হচ্ছে?

আমাকেও যেতে হবে গোঁসাই। নির্দোষীকে দূর ক'রে যদি নিজে থাকি, তবে মিথ্যেই এ পথে এসেছিলাম, মিথ্যেই এতদিন তাঁর নাম নিয়েছি।

তবে কেনই বা তাকে যেতে হবে? মঠের কর্তা ত তুমি—তুমি ত তাকে রাখতে পারো?

গুরু! গুরু! গুরু! বলিয়া দ্বারিকদাস অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। বুঝিলাম গুরুর আদেশ—ইহার অন্যথা নাই।

আজ আমি চ'লে যাচ্ছি গোঁসাই, বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিবার কালে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, দেখি, চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, আমাকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন, আমি প্রতিনমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ক্রমে অপরাহ্ণ-বেলা সায়াহ্নে গড়াইয়া পড়িল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি আসিল, কিন্তু কমললতার দেখা নাই। নবীনের লোক আসিয়া উপস্থিত, আমাকে স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবে, ব্যাগ মাথায় লইয়া কিষণ ছট্‌ফট্ করিতেছে—সময় আর নাই—

কিন্তু কমললতা ফিরিল না। পদ্মার বিশ্বাস সে আর একটু পরেই আসিবে, কিন্তু আমার সন্দেহ ক্রমশঃ প্রত্যয়ে দাঁড়াইল—সে আসিবে না। শেষ বিদায়ের কঠোর পরীক্ষায় পরাঙ্মুখ হইয়া সে পূর্বাহ্নেই পলায়ন করিয়াছে, দ্বিতীয় বস্ত্রটুকুও সঙ্গে লয় নাই। কাল আত্মপরিচয় দিয়াছিল ভিক্ষুক বৈরাগিণী বলিয়া, আজ সেই পরিচয়ই সে অক্ষুণ্ণ রাখিল।

যাবার সময় পদ্মা কাঁদিতে লাগিল। আমার ঠিকানা দিয়া বলিলাম, দিদি বলেছে আমাকে চিঠি লিখতে—তোমার যা ইচ্ছে তাই আমাকে লিখে জানিও পদ্মা।

কিন্তু আমি ত ভাল লিখতে জানি নে গোঁসাই।

তুমি যা লিখবে আমি তাই পড়ে নেবো।

দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে না।

আবার দেখা হবে পদ্মা, আজ আমি যাই, বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

॥ দশ ॥

সমস্ত পথ চোখ যাহাকে অন্ধকারেও খুঁজিতেছিল, তাহার দেখা পাইলাম রেলওয়ে স্টেশনে। লোকের ভিড় হইতে দূরে দাঁড়াইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল, একখানি টিকিট কিনে দিতে হবে গোঁসাই—

সত্যি তবে সকলকে ছেড়ে চল্‌লে?

এ ছাড়া ত আর উপায় নেই।

কষ্ট হয় না, কমললতা?

এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করো গোঁসাই, জানো ত সব।

কোথায় যাবে?

যাবো বৃন্দাবনে; কিন্তু অতো দূরের টিকিট চাই নে—তুমি কাছাকাছি কোন একটা জায়গার কিনে দাও।

অর্থাৎ আমার ঋণ যত কম হয়। তারপর শুরু হবে পরের কাছে ভিক্ষে, যতদিন না পথ শেষ হয়। এই ত?

ভিক্ষে কি এই প্রথম শুরু হবে, গোঁসাই? আর কি কখনো করি নি?

চুপ করিয়া রহিলাম। সে আমার পানে চাহিয়া চোখ ফিরাইয়া লইল, কহিল, দাও বৃন্দাবনেরই টিকিট কিনে।

তবে চলো একসঙ্গে যাই?

তোমার কি ঐ এক পথ নাকি?

বলিলাম, না এক নয়, তবু যতটুকু এক ক'রে নিতে পারি।

গাড়ি আসিলে দুজনে উঠিয়া বসিলাম। পাশের বেঞ্চে নিজের হাতে তাহার

বিছানা করিয়া দিলাম।

কমললতা ব্যস্ত হইয়া উঠিল—ও কি করচো গোঁসাই?

করচি যা কখনো কারো জন্যে করে নি—চিরদিন মনে থাকবে ব'লে।

সত্যি কি মনে রাখতে চাও?

সত্যিই মনে রাখতে চাই, কমললতা। তুমি ছাড়া সে কথা আর কেউ জানবে না।

কিন্তু আমার যে অপরাধ হবে, গোঁসাই?

না, অপরাধ হবে না—তুমি স্বচ্ছন্দে বসো।

কমললতা বসিল, কিন্তু বড় সঙ্কোচের সহিত। গাড়ি চলিতে লাগিল কত গ্রাম, কত নগর, কত প্রান্তর পার হইয়া—অদূরে বসিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার জীবনের কত কাহিনীই বলিতে লাগিল। তাহার পথে বেড়ানোর কথা, তাহার মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড বাসের কথা, কত তীর্থ ভ্রমণের গল্প, শেষে দ্বারিকাদাসের আশ্রমে মুরারিপুর আশ্রমে আসা। আমার মনে পড়িয়া গেল ঐ লোকটির বিদায়কালের কথাগুলি, বলিলাম, জানো কমললতা, বড়গোঁসাই তোমার কলঙ্ক বিশ্বাস করেন না।

করেন না?

একেবারে না। আমার আসবার সময়ে তাঁর চোখে জল পড়তে লাগলো, বললেন, নির্দোষকে দূর ক'রে যদি নিজে থাকি নতুনগোঁসাই, মিথ্যে তাঁর নাম নেওয়া, মিথ্যে আমার এ পথে আসা। মঠে তিনিও থাকবেন না কমললতা, এমন নিষ্পাপ মধুর আশ্রমটি একেবারে ভেঙে নষ্ট হয়ে যাবে।

না, যাবে না, একটা কোন পথ ঠাকুর নিশ্চয় দেখিয়ে দেবেন।

যদি কখনো তোমার ডাক পড়ে, ফিরে যাবে সেখানে?

না।

তাঁরা যদি অনুতপ্ত হয়ে তোমাকে ফিরে চান?

তবুও না।

একটু পরে কি ভাবিয়া কহিল, শুধু যাবো যদি যেতে বলো। আর কারো কথায় না।

কিন্তু কোথায় তোমার দেখা পাবো?

এ প্রশ্নের উত্তর সে দিল না, চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে ডাকিলাম, কমললতার সাড়া আসিল না, চাহিয়া দেখিলাম সে গাড়ির এককোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়াছে। সারাদিনের শ্রান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া ডাকিয়া তুলিতে ইচ্ছা হইল না। তারপরে নিজেও যে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না। হঠাৎ একসময়ে কানে গেল—নতুনগোঁসাই?

চাহিয়া দেখি সে আমার গায়ে হাত দিয়া ডাকিতেছে। কহিল ওঠো, তোমার সাঁইথিয়ার গাড়ি দাঁড়িয়েছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম, পাশের কামরায় কিষণ ছিল, ডাকিয়া তুলিতে সে আসিয়া ব্যাগ নামাইল, বিছানা বাঁধিতে গিয়া দেখা গেল যে দু-একখানায় তাহার শয্যা

রচনা করিয়া দিয়াছিলাম, সে তাহা ইতিপূর্বেই ভাঁজ করিয়া আমার বেঞ্চের একধারে রাখিয়াছে। কহিলাম, এটুকুও তুমি ফিরিয়ে দিলে—নিলে না?

কতবার ওঠানামা করতে হবে, এ বোঝা বইবে কে?

দ্বিতীয় বস্ত্রটিও সঙ্গে আনো নি—সেও কি বোঝা? দেবো দু-একটা বা'র করে?

বেশ যা হোক তুমি। তোমার কাপড় ভিখারীর গায়ে মানাবে কেন?

বলিলাম, কাপড় মানাবে না, কিন্তু ভিখারীকেও খেতে হয়। পেঁছতে আরও দুদিন লাগবে, গাড়িতে খাবে কি? যে খাবারগুলো আমার সঙ্গে আছে তাও কি ফেলে দিয়ে যাবো—তুমি ছোঁবে না?

কমললতা এবার হাসিয়া বলিল, ইস্, রাগ দ্যাখো? ওগো, ছোঁব গো ছোঁব; থাক ও সব, তুমি চ'লে গেলে আমি পেট ভরে গিলবো।

সময় শেষ হইতেছে, আমার নামিবার মুখে কহিল, একটু দাঁড়াও ত গোঁসাই, কেউ নেই, আজ লুকিয়ে তোমায় একটা প্রণাম ক'রে নিই। এই বলিয়া হেঁট হইয়া আজ সে আমার পায়ের ধুলো লইল।

প্ল্যাটফর্মে নামিয়া দাঁড়াইলাম। রাত্রি তখনো পোহায় নাই। নীচে ও উপরের অন্ধকার স্তরে একটা ভাগাভাগি শুরু হইয়াছে, আকাশের একপ্রান্তে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ পূর্ণশশী, অপর প্রান্তে ঊষার আগমনী! সেদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন ঠাকুরের ফুল তুলিতে এমনি তাহার সাথী হইয়াছিলাম। আর আজ?

বাঁশী বাজাইয়া সবুজ আলোর লণ্ঠন নাড়িয়া গার্ডসাহেব যাত্রার সংকেত করিল। কমললতা জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া এই প্রথম আমার হাত ধরিল, কণ্ঠে কি যে মিনতির সুর তাহা বুঝাইব কি করিয়া? বলিল, তোমার কাছে কখনো কিছু চাই নি —আজ একটি কথা রাখবে?

হাঁ, রাখবো, বলিয়া চাহিয়া রহিলাম।

বলিতে তাহার একমুহূর্ত বাধিল, তারপর কহিল, আমি জানি, আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস ক'রে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও। আমার জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ করো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তাহার সেই হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলাম, তোমাকে তাঁকেই দিলাম কমললতা, তিনিই তোমার ভার নিন। তোমার পথ, তোমার সাধনা নিরাপদ হোক—আমার ব'লে আর তোমাকে অসম্মান করবো না।

হাত ছাড়িয়া দিলাম, গাড়ি দূর হইতে দূরে চলিল, গবাক্ষপথে তাহার আনত মুখের 'পরে স্টেশনের সারি সারি আলো কয়েকবার আসিয়া পড়িয়া আবার সমস্ত অন্ধকারে মিলাইল। শুধু মনে হইল হাত তুলিয়া সে যেন আমাকে শেষ নমস্কার জানাইল।

: সমাপ্ত :